পঞ্চম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা নাটকে মনসা-কথার নবনির্মাণ

১৭৯৫ সালের ১৭-ই নভেম্বর কলকাতার চিনেবাজারের কাছে ডোমতলায় রুশ নাট্যরসিক হেরাশিম লেবেডফের উদ্যোগে বেঙ্গলি থিয়েটারে দুটি বাংলা অনূদিত নাটকের মঞ্চস্থকে কেন্দ্র করে সূচনা হয় বাংলা নাটকের। তবে মৌলিক বাংলা নাটকের প্রবেশ্যক রূপে পাওয়া যায় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীণ-কুল-সর্বস্ব' (১৮৫৭) নাটকটি। এরপরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নাট্যকারদের হাতে বাংলা নাটক পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ট্রাজেডি, কমেডি, রূপক-সাংকেতিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক, পৌরাণিক নাটক প্রভৃতি বিভিন্ন শাখার রূপ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে বাংলা নাটক।

পৌরাণিক নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যের অন্যতম একটি শাখা। বাংলায় গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাট্যরচনার প্রাণপুরুষ। উনিশ শতকের শেষে যাত্রা-কথকতা-হাফ আখড়াইতে অভ্যস্ত সাধারণ বাঙালি দর্শকের মনের কথা সঠিকভাবে আঁচ করে এ ধরনের নাটকের সূচনা করেন গিরিশচন্দ্র। এর পরে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের হাতে এই পৌরাণিক ও ভক্তিরসাত্মক নাটকের অগ্রগতি ঘটে।

বাংলা পৌরাণিক নাটকের ইতিহাসকে লক্ষ করলে দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাত ধরে দেবতার আধিপত্য, অলৌকিকতাবাদ, অদৃষ্টবাদ কমতে থাকে। ভক্তিবাদের জায়গায় যুক্তিবাদ, দৈবী আধিপত্যের বদলে দ্বন্দ্বময়তা প্রখর হয়ে ওঠে। জন্মলগ্নে পৌরাণিক নাটকে অলৌকিকতা ও মিথের প্রাধান্য থাকলেও পরবর্তীকালে যুক্তি অনুশাসনের দ্বারা তাকে বিচার করে প্রয়োগ করা হয়। আর এই কারণেই দেবত্ব অপেক্ষা পূর্ণ মানবত্ব ক্রমে বেশি প্রধান্য পায়। পৌরাণিক নাটকে ক্রমশ দ্বন্দ্বই প্রাণ হয়ে ওঠে। দেবতার সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম, আস্তিকতার সঙ্গে নাস্তিকতার বিরোধ দেখা যায়। পৌরাণিকতার ছদ্মবেশে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়বাদ প্রচারিত হতে থাকে। পুরাণের আধুনিক ব্যাখ্যা ক্রমে পৌরাণিক নাটকে উপজীব্য হয়ে ওঠে। নিছক ঐতিহ্যের অনুবর্তনের জন্য আর পুরাণ ফিরে এলো না। পুরাণকে নতুনভাবে গড়ে তোলেন এবং পুরাণের পুনর্জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করেন নাট্যকারেরা।

তবে রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য সংস্কৃত পুরাণকে অবলম্বন করেই শুধু নাটক লেখা হয়নি। বাংলার সাধারণ মানুষের কাব্য তথা লোকপুরাণকে কেন্দ্র করেও নাটক রচিত হয়। বিশেষ

করে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীকে নিয়ে আধুনিককালে কতকগুলি নাটক রচিত হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি নাটকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে মনসার কাহিনীর। এই নাটকগুলির মধ্যে প্রথমেই মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর' নাটকটির কথা বলা যেতে পারে। এছাড়া অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সওদাগরের নৌকা' (১৯৭৬), শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' (১৯৭৮) এবং সবশেষে শেখর দেবরায়ের 'মনসা কথা' (২০০২) নাটকটি পেয়ে থাকি।

উক্ত নাটকগুলিতে মনসা-কথার নবরূপায়ণ কীভাবে ঘটেছে, বর্তমান অধ্যায়ে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার **শ্রী মন্মথ রায়ের** (১৬ জুন, ১৮৯৯-২৬ আগস্ট, ১৯৮৮) নাটক রচনার নানা শাখা-প্রশাখায় ছিল অবাধ বিচরণ। পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, বাণিজ্যিক একাঙ্ক নাটক, রূপক নাটক— সব বিষয়েই তিনি লেখনী ধরেছেন। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নাটক রচনায় তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর পৌরাণিক নাটক পৌরাণিক হয়েও সমকালের সঙ্গে অন্বিত। দেশ ও সমাজকে বুঝবার জন্যেই তিনি পুরাণকে প্রতীকের আকারে গ্রহণ করেছেন, পুরাণকে নতুনের বাতাবরণে হাজির করেছেন। ভক্তিবাদের জায়গায় যুক্তিবাদ, আধুনিক জীবনবোধ, স্বাধীনতা কামনা, স্বদেশ প্রীতি, স্বজাত্যবোধ উঠে এসেছে প্রতিটি নাটকে। আসলে ঊনবিংশ শতকের পৌরাণিক নাটকের গতানুগতিকতাকে মন্মথ রায়ই ভাঙার চেষ্টা করেছেন প্রথম। তাই তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিতে পুরাণের বিশেষ ঘটনা বা কাহিনী থাকলেও নেই পৌরাণিক ভাব, আদর্শ ও নীতি। চির ধর্মাদর্শ বা ভক্তিভাবের পরিবর্তে এসেছে গতানুগতিক পৌরাণিক সংস্কার ও নিষ্ঠার প্রতি বিদ্রোহের ইঙ্গিত। 'চাঁদ সদাগর', 'দেবাসুর', 'সাবিত্রী' ইত্যাদি তাঁর পৌরাণিক নাটকের মধ্যে অন্যতম।

সচেতন নাট্যকার রূপে মন্মথ রায় অত্যন্ত সতর্ক পর্যবেক্ষণ নিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এমন নাটক লিখতে হবে যাতে নাট্যসৃষ্টির প্রধান চমক যেন শুধু অভিনয় কেন্দ্রিক না হয়— নাট্য বিষয় এবং উপস্থাপনার অভিনবত্বের পাশাপাশি তা যেন যুগোপযোগী ও সমকালীন হয়েছে। এই বিশ্বাস থেকেই ১৯২৭ সালে সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শক রুচি, জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে লৌকিক পুরাণ মনসামঙ্গলের কাহিনী নিয়ে তিনি লিখলেন **'চাঁদ সদাগর'**। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে প্রতিভাষিত করে তুললেন সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তা, স্বাধীনতার কামনা, স্বদেশপ্রীতি, সমানাধিকারের দাবি এবং সর্বাধিক কামনাকে। ১৯২৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর বিপুল সমারোহে মনোমোহন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় 'চাঁদ সদাগর' নাটকটি। ১৯১৭ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত

মন্মথ রায় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক মিলিয়ে মোট পঁচিশটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছেন। তার মধ্যে মনসামঙ্গলের সুপ্রচলিত কাহিনী অনুসরণ করে তিন অঙ্কের মোট ১৫টি দৃশ্যের লিখিত নাটক 'চাঁদ সদাগর'। নাটকের প্রথমেই আমরা দেখি কালীদহ তীরে কুঞ্জবীথিতলে বটবৃক্ষের গুড়িতে মাথা রেখে মনসাদেবী অর্দ্ধশায়িতভাবে বিশ্রাম করছেন এবং সর্পসঙ্গিনীরা গান গেয়ে তাঁর চোখে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে। পুত্র আস্তীক সেই মুহূর্তে চম্পকনগরের চাঁদ সদাগরের মনসা পূজা নিষেধাজ্ঞা জারির খবর নিয়ে আসে। পূজা না পাওয়ার যে দুঃখ, কষ্ট, দুশ্চিন্তা, সেই সঙ্গে আস্তিকের সংবাদে মনসা আরো ভেঙে পড়েন। এই ঘৃণা, অপমান পাওয়া সত্ত্বেও পূজা পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। দাম্ভিক সদাগরের দর্প চূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা করেন। কারণ শিবের বিধান অনুযায়ী চাঁদ পূজা না করলে মর্ত্যে মনসা পূজা হবে না। অন্যদিকে চাঁদ সদাগরের সিংহ দুয়ারে বিরাজমান শিব-চণ্ডীর স্বর্ণমূর্তি, সেখানে মনসাপূজা রাজাজ্ঞায় নিষেধ করে দেয়। পূজা দিলে দেবী তাকে ধরণীশ্বর করবে শুনেও চাঁদ নিজের সিদ্ধান্তে অটল, পূজার কথায় থুৎকার দেয়। নাটকের প্রথমেই মনসা ও চাঁদের সংলাপের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে—

> ''মনসা। শোন সদাগর ... যদি আমার পূজা কর, ধনরত্ন পুত্রকলত্রে তুমি স্বর্গসুখের অধিকারী হবে। আর যদি পূজা না কর... তোমার সর্ব্বনাশ।
> চাঁদ। (ঘৃণায় রাগে উত্তেজনায়) থুৎ। (নিষ্ঠাবন ত্যাগ করিয়াই চলিয়া যাইতেছিল— হঠাৎ ফিরিয়া) শোন কানী! স্বর্গের শিবশম্ভু আর মর্ত্যের ধন্বন্তরী আমার জাগ্রত রক্ষা-কবচ। দেবতা যার সহায়, সে অপদেবতাকে ভয় করে না।''[১]

কুঞ্জবীথি বনে সুন্দরী রমণীর ছদ্মবেশে ছলনা করে শিবের মহাজ্ঞান হরণ করেন মনসা। তবুও চাঁদ চেঙ্গমুড়ী কানীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে অপদেবতা বলে। সর্পদেবীর সঙ্গে লড়াই-এ চাঁদের অন্যতম শক্তি ধন্বন্তরি ওঝার বাড়ির দুয়ারে ধনা ও মনা পাহারা দেয় শনিবারে অমাবস্যায় অশ্লেষা নক্ষত্রে কালবেলায়। মনসার বোন নেতা গোয়ালিনী ছদ্মবেশে ধনা-মনাকে বোকা বানিয়ে দধিভাণ্ডে সাপ রেখে আসে। ধন্বন্তরি ওঝা, মনসা প্রেরিত সাপের দংশনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সেই সঙ্গে সনকার বুক খালি করে চাঁদ-সনকার ছয় পুত্রেরও সর্পদংশনে মৃত্যু হয়। যায় যাক, তার ছয় পুত্র। কিন্তু ধন্বন্তরিকে বাঁচাতে বলে চাঁদ ধন্বন্তরিকে পুনরায় ঘরে বন্ধ করার কথা বলে। ধন্বন্তরিকে বাঁচাতে না পারলে ছয় পুত্রের পুনর্জীবনের কথা না ভেবে দামামা বাজিয়ে নগরে নগরে প্রচার করে, রাজ্যে যে মনসাপূজা করবে তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। ছয়পুত্রের মায়া, বন্ধন, মোহ সব কাটিয়ে সে আপন

শৌর্যে উজ্জ্বল হয়। রাজপ্রাসাদে শিব মন্দিরের সামনে চাঁদ শোকে ভেঙে পড়লে দেবী চণ্ডী স্বয়ং এই শোককে গর্বের ও গৌরবের শোক বলে উল্লেখ করেন। চাঁদ মৃত্যু কামনা করলে এই দুর্দশাকে কঠিন পরীক্ষা বলেন গৃহদেবী চণ্ডী। চাঁদের নিজের বাড়িতেই মনসার ঘট স্থাপিত হয়েছে জেনে দেবী চণ্ডী বাড়ি থেকে বিদায় নেন। চাঁদের মতে সেই সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবও গৃহত্যাগ করেছেন। সনকা গর্ভের সন্তানের মঙ্গল কামনায় শিব-চণ্ডীর বিগ্রহের নিচে যে মনসার ঘট স্থাপন করেন, চাঁদ জানতে পেরে তা ভেঙে ফেলে এবং রক্ষী সৈন্যগণকে আদেশ দেয় গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে প্রচার করতে যে চাঁদের রাজ্যে শুধু মনসাপূজাই নিষেধ নয়, যে যেখানে মনসার ঘট দেখবে, পদাঘাতে তা ভেঙে ফেলে। সনকাকে উদ্দেশ্য করে বলে—

> ''চাঁদ। হাঃ হাঃ হাঃ (বিকট অট্টহাস্য) পুত্র হবে। সোনার চাঁদ পুত্র হবে! ছয় ছয় পুত্রের শোক ভুলিয়ে দেবে— তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে মনসার পূজা চাই! (সনকাকে লক্ষ্য করিয়া) কেমন পূজা হলো! চেঙ্গমুড়ী কানীর এমনি পূজা দেশে দেশে প্রচার করার জন্য আমি বাণিজ্যে যাব। দুর্য্যোধন, আমার সপ্তডিঙা মধুকর সাজাও ...''[২]

প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে আমরা দেখি মধুকর, শঙ্খচূড়, রত্নাবলী, দুর্গাবর, খরসান, উদয়তারা ও কাজলরেখা ইত্যাদি সপ্তডিঙা নিয়ে চাঁদ সদাগর দক্ষিণ পাটনের তীরে মিত্র চন্দ্রকেতুর দেশে যায় বাণিজ্য করতে। মিত্র চন্দ্রকেতু দক্ষিণ পাটনে মনসাপূজার প্রচলন করেছে। তাঁর মনে মনসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সঞ্চার করবে চাঁদ এই ভয়ে দেবী কালিদহে ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত সহ তুফানের সৃষ্টি করে সপ্তডিঙা মধুকর ধ্বংস করে দেন। সর্বস্ব হারিয়ে চাঁদ চন্দ্রকেতুর প্রাসাদে গিয়ে উঠবেন, তারপর নিজের কপালে পদাঘাত ও থুৎকার মিলবে ভেবে দেবী মনসা মনোবল হারিয়ে ফেলেন। নেতা হয় মারতে নয় মরতে বললে মনসা দুঃখের সহিত বলেন—

> ''মনসা। মরবার উপায় নেই নেতা। শিব যখন জন্মদাতা, তখন দেবতা বইকি। ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে, অত্যাচারে সহস্রবার মৃত্যুকামনা করলেও মরণ নেই... মরণ নেই।''[৩]

অন্যদিকে সরাসরি না মেরে মায়াযুদ্ধে চাঁদকে শায়েস্তা করার সংকল্প করেন। কালীদহের তুফানে চাঁদকে ডুবিয়ে দিয়ে নেতা কর্তৃক কালীদহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর শরণের দৈববাণী শুনিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেন। মায়াবলে দেবী চাঁদকে পদ্মফুলের দ্বারা বাঁচিয়ে তুললে চাঁদ মনসার কৃপায় বাঁচতে নারাজ। চাঁদের এই নিষ্ঠা দেখে মনসা মুগ্ধ হয়েছেন, বিস্মিতও হয়েছেন। এই জন্যই চাঁদের হাতে

পূজা পাবার লোভে মনসা আজ মাতাল হয়ে চললেন। কোনরকমে প্রাণটুকু নিয়ে বন্ধু চন্দ্রকেতুর প্রাসাদে গিয়ে উঠলে সেখানে মনসা পূজার আয়োজন দেখে চাঁদ অতিদ্রুত বেরিয়ে পড়েন।

নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমেই দেখি নিছনিনগরের সায় সদাগর তথা বেহুলার পিতা বাণিজ্য থেকে ফিরে প্রাসাদ ভবনের মধ্যস্থ নাটমন্দিরে পুরোহিতের সঙ্গে নগরের ইন্দ্রপূজা সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যস্ত। সেই সঙ্গে দৌবারিকের মুখে সর্পহত্যার কথা শুনলে তিনি আশঙ্কাগ্রস্থ হয়ে নিজ রাজ্যে সর্প নাশের জন্য মনসা দেবীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। নিজের অজ্ঞতার জন্য দেবীর কাছে মিনতি করে। সায় সদাগরের কাছে পিতার সংবাদ জানতে এলে লখীন্দরের সঙ্গে সদাগর কন্যা তথা নগরের শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী বেহুলার সাক্ষাৎ হয়। বেহুলা-লখীন্দরের সূক্ষ্ম রোমান্টিকতার পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। বেহুলা ময়ূর ও হাতীর দাঁতের সিদুঁর কৌটা আবদার করে লখীন্দরের কাছে। চাঁদ সদাগরের সঙ্গে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত বেহুলার বিবাহের বাক্‌দান করেন সায়বেনে লখীন্দরের কাছে ইন্দ্রদেবতা ও মনসার কাছে আশীর্বাদ নিয়ে। অন্যদিকে লখীন্দরের ময়ূর নিছনিনগরের সাপ মেরেছে শুনে দেবী চণ্ডীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রাসাদে মনসার যজ্ঞের আয়োজন করে সনকা। চাঁদের পুরীতে এই মনসা পূজার আয়োজন, চণ্ডীর এই পুরীতে মনসার যজ্ঞ, ধন্বন্তরীর দেশে সর্পপূজা এই সমস্ত মেনে নিতে পারেনি চাঁদ ভৃত্য নেড়া। তার অন্তরের হাহাকার নাটকে অন্যমাত্রা নিয়ে এসেছে। যজ্ঞস্থানে সর্পের জন্য দুধ-কলার আয়োজন করলে সেখানে আকস্মিকভাবে বেহুলা উপস্থিত হয়। লখীন্দরের অনুরোধে সে পিতাকে নিয়ে চম্পক নগরে শিবপূজা দেখতে এসেছে। এই দৃশ্যেই সব কিছু হারিয়ে, খিড়কির পথে, ছিন্ন ভিন্ন বেশে চম্পকনগরের অধিপতি চাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তন ঘটে এবং পুত্র লখীন্দরের সঙ্গে চাঁদের সাক্ষাত হয়। মনসার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য লোহার বাসরঘর নির্মাণ করে মহাসমারোহে বেহুলা লখীন্দরের বিবাহের আয়োজন করে। সাঁতালি পর্বতে লৌহের প্রাচীর, লৌহের কপাট, লৌহের ছাদ এবং লৌহের ভিত্তিযুক্ত ঘরেও কর্মকার কালুকে সর্পদংশনের ভয় দেখিয়ে সূচ প্রমাণ ছিদ্র রাখতে বাধ্য করান নেতা ও দেবী মনসা। বাসররাতে সতী বেহুলা অহীরাজ, মহীরাজ, সাপকে বন্দী করতে পারলেও কালনাগিনী সাপের দংশনে লক্ষীন্দরের মৃত্যু হয়। চাঁদ এখানে চেঙ্গমুড়ী কানীর উচ্ছিষ্ট দেহ জলে ভাসিয়ে দিতে বলে এই আশায় যে অনেক সময় জলের গুণে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে। যা পুরাণেও রয়েছে এবং তিনি গল্পেও শুনেছেন। নাটকে দেখি বেহুলাকে চাঁদ নিজে ভেলা প্রস্তুত করে দেয়। সাবিত্রী যেমন যমরাজকে জয় করে স্বামী সত্যবানকে পুনর্জীবিত করে, বেহুলাও তেমনি গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যায় স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য। বেহুলার এই কষ্ট দেবী মনসা সহ্য করতে না পেরে বেদনাগ্রস্থ হন এবং নেতা ধোপানীকে

পাঠান বেহুলাকে স্বর্গের পথ দেখাতে—

> ''মনসা। আর তো ও দৃশ্য দেখতে পারিনে বোন। ঐ গলিত-চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল, তাই নিয়ে চলেছে— দিনের পর দিন-রাত্রির পর রাত্রি— ক্ষুধার তাড়না সহ্য করে, ঘুম জয় করে, ভয় ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়ে চলেছে— পথের শেষ নেই— তবু চলেছে। ওর ঐ কষ্ট আর তো আমি সহ্য করতে পারছিনে বোন্।''[৪]

স্বর্গের ধোপানী নেতা কর্তৃক পুত্র-বৃশ্চিককে চপেটাঘাতে মেরে ফেলা এবং পুনরায় জীবিত করার দৃশ্যে বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার পথ খুঁজে পেয়ে নেতার কাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চায়। নেতার সহযোগিতায় বেহুলা স্বর্গে দেবসভায় উপস্থিত হয়ে নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সকলের মন জয় করে এবং পুরস্কার স্বরূপ স্বামীর পুনর্জীবন চায়। চাঁদ সদাগর মনসার পূজা না করায় লখীন্দরের জীবন ফিরিয়ে দিতে দেবতাগণ ইতঃস্তত করলে এবং উপায় খুঁজতে মরিয়া হলে মনসা নিজেই পুরস্কার প্রদানের কথা বলেন। চাঁদ পূজা করেনি জেনেও বেহুলার মতো তাপসী, সতীকুলনারীর চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্য লখীন্দরের জীবন ফিরিয়ে দেন। যে নারী স্বামীকে পুনর্জীবিত করার লক্ষ্যে নিজের জীবন তোয়াক্কা না করে অনির্দিষ্ট পথে ভেসে যেতে পারে— তাকে পুরস্কৃত করতে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে গিয়ে যদি নিজের পূজা পাওয়ার আশা চিরকালের মতো অন্তর্হিত হয় হোক। তাতে কোনো দুঃখ নেই। মনসা নিজেই পূজা পাওয়ার আশা ত্যাগ করলে বেহুলা-লখীন্দর মহাদেবী মনসার পূজা করবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। নাটকের শেষে দেখি বেহুলা চম্পকনগরের প্রাসাদে উপস্থিত হয় এবং প্রাসাদের মন্দিরেই সনকার সঙ্গে মনসা পূজার আরতি দেয়। চাঁদ মনসা প্রতিমা চূর্ণ করতে গেলে হৃতশাবা বাঘিনীর মতো সনকা বাধা দেয়। তার হারানো শেষ সন্তান লখীন্দর বেঁচে উঠবে এই আশা নিয়ে সনকা উজ্জ্বল প্রতিমা মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা করে বিষহরি দেবীর পূজা করছে, স্বামী চাঁদ তাতে বাধা দিতে গেলে কান্নার সহিত তাঁর প্রতি অভিযোগ জানায়—

> ''সে তোমার আদরের খেলনা ... আমার কষ্টের ধন... তুমি বোঝ না ... তাকে পাওয়া কতখানি কষ্ট! ... পূজার বাজী রেখে তোমার খেলনা হারিয়েছ আর আমি হারিয়েছি ... আমার দুঃখের মাণিক... কষ্টের ধন।''[৫]

নিজের স্ত্রীর মুখে এই কথা শুনে এবং নিজের প্রাসাদ মন্দিরে মনসার প্রতিমা দেখে দুঃখে কষ্টে চাঁদ রাজ্যে মনসা পূজা করার কথা ঘোষণা করতে আদেশ দেয়। কিন্তু নিজে ভৃত্য নেড়ার সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করে, রাজ্য ত্যাগ করে পাহাড়ের গুহায় যেতে উদ্যত হয়। চেঙ্গমুড়ী কানী মনসাকে ভীরুর

দেবতা, কাপুরুষের দেবতা, দুর্বলের দেবতা বলে। চাঁদের মতো সামান্য মানবের জন্য মনসার ভক্তরা এতদিন পূজা করতে পারেনি। আজ সেই শাসনের দড়ি আলগা করলেন, ওরা ছুটেছে দেবীর পায়ে পদ্মফুলের ঢিল ছুঁড়তে।

নাটকের শেষে দেখা যায় ব্রহ্মা নয়, বিষ্ণু নয়, শিব নয়— মা মনসার দয়ায় লখীন্দর পুনর্জন্ম পেয়ে চম্পকনগরে ফিরে আসে, প্রতিদানে দেবীকে চাঁদ সদাগরের পূজা নিবেদনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তবে যে হাতে দেবাদিদেব মহাদেবকে পূজা নিবেদন করেছেন, সেই হাতে মনসা পূজা করবেন না চাঁদ। এই সময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে শিবের আবির্ভাব ঘটে এবং চাঁদকে মনসা পূজা করার আদেশ দেন। মনসার সঙ্গে বিরোধের কারণে চাঁদ শিবের শিরোভূষণ থেকে সর্প বাদ দিয়েছেন। নিজের খেয়াল বশে অসম্পূর্ণ শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে দাম্ভিকতার, অহঙ্কারের ও আত্মম্ভরিতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু পূজা দম্ভের সামগ্রী নয়— পূজা আত্মার বিনয়। যা বহুকাল ধরে চাঁদের পূজা থেকে নির্বাসিত হয়েছে। নাট্যকার এই প্রসঙ্গে শিবের মুখে যে সংলাপটি দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—

> ''যদি শিব বিরাট হন— যদি শিব অসীম অনন্ত হন... তবে ঐ মনসাদেবী ... তিনিও কি তারই বিরাট অসীম অনন্ত রূপের অন্তর্ভুক্ত নন?... মনসা যে শিবাত্মজা। সকল দেবতাই যে সেই দেবাদিদেবের আংশিক রূপান্তর মাত্র। ... যার এই জ্ঞান নেই অথবা যার ভেদজ্ঞান এত প্রবল ... সে শিবপূজা করে না... মূর্খতার পূজা করে ... সে ক্ষুদ্রতার পূজা করে ... তার পূজা— পূজা নয় ... তার পূজা ব্যভিচার।''[৬]

চাঁদ অনুশোচনাগ্রস্থ হয়ে ইষ্টদেবতা মহাদেবকে দেখা দিতে বললে পদতলে মনসা আসীন শিবমূর্তির প্রকাশ পায়। শিব এখানে মনসাকে নিজের মানস কন্যা রূপে অভিহিত করেছেন। আরো বলেন— বেহুলার অলৌকিক তপস্যা, অস্বাভাবিক সততায় মুগ্ধ, বিস্মিত ও প্রীত হয়েছেন মনসাদেবী। নিজের পূজা পাওয়ার আশা ত্যাগ করে মহাদেবীর মতো বিপুল ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়ে লখীন্দরকে জীবিত করে তোলেন। আপাত দৃষ্টিতে দেবী মনসার পরাজয় মনে হলেও মহাদেবী থেকে মহত্তর হয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই দেবীকে পূজা করা আসলে শিবকেই পূজা করার নামান্তর মাত্র। চাঁদ অত্যন্ত সকাতরভাবে শিবের কাছে নিবেদন রাখেন— যে হাতে তাঁর পূজা করে, সে হাতে মনসার পূজা কীভাবে করবে। মনসা এখানে স্পষ্টভাবে বলেন যে— বাম হাতে পূজা পেলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন— ''বাম হাতেই আমায় পূজা দাও চাঁদ ... আমি তাতেই প্রীত হব।''[৭] মনসার এই

প্রস্তাব ও সনকা-বেহুলার আবেগপ্রবণ অনুরোধে চাঁদ নিজের অপরাধের ক্ষমা চেয়ে বাম হাতে পূজা দিতে সম্মত হয়। ডান হাতে চোখ বন্ধ করে বাম হাতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে চাঁদ যেন ভেঙে পড়ে।

প্রবল হৃদয়বৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে যেখানে নাট্যঘটনা প্রচণ্ড বেগসম্পন্ন সেখানেই মন্মথ রায়ের নাট্যকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির অন্তহীন সংগ্রামকে ক্ষতবিক্ষত মানুষের চরিত্র চিত্রণেই অধিকতর আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আপাত অসামঞ্জস্য ক্রিয়াকলা পর্ব তাঁর নাটকে ঘনীভূত নাট্যরস সৃষ্টি করেছে। চরিত্রের বলিষ্ঠতা, দার্ঢ্য, স্পর্ধিত মহিমা ও চমকপ্রদ আচরণ দেখানোতেই তাঁর শৈল্পিক উল্লাস প্রকাশ পেয়েছে। সেই জন্য পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশেই তাঁর নাট্যপ্রতিভা এক মহিমাঙ্কিত স্তর স্পর্শ করেছে। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক জগতের পাত্র-পাত্রীদের বর্ণাঢ্য জীবন এবং হৃদয়বৃত্তির প্রচণ্ডতা যেখানে তিনি দেখিয়েছেন সেখানে অতিনাটকীয়তা সত্ত্বেও ঘটনার স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাঁর প্রথম দিকের সৃষ্টি আলোচ্য 'চাঁদ সদাগর' সম্পর্কে প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক অজিত কুমার ঘোষ 'মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলীর ভূমিকাংশে যা বলেছেন এখানে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন—

> ''চাঁদ সদাগর নাটকে কংসের ন্যায় দেবদ্বেষী চাঁদ সদাগর চরিত্রের ট্রাজিক মাহাত্ম্য নাট্যকার সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। চাঁদ সদাগরের বজ্রকঠোর ব্যক্তিত্ব, তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা ও অপরাজেয় পৌরুষ নাটকের মধ্যে ঘনীভূত নাট্যরস সৃষ্টি করেছে। নাটকের মনসা চরিত্রের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের মনসাদেবীর অকারণ নীচতা এক উদ্দেশ্যহীন ক্ষতিকারকতার নিদর্শন দেখা যায় না। বলা বাহুল্য মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলির ন্যায় এই নাটকেও ভক্তিরস অপেক্ষা মানবীয় রসই প্রধান হয়ে উঠেছে।''[৮]

মনসামঙ্গলের সুপ্রচলিত কাহিনীকে অনুসরণ করে 'চাঁদ সদাগর' রচনা করলেও নাট্যকারের ভাবনায় নতুনরূপে গড়ে উঠেছে নাটকটি। আসলে তিনি শিল্পী ও স্রষ্টার সামাজিক, রাজনৈতিক দায়বদ্ধতায় বিশ্বাসী থেকেছেন আজীবন। দুই-এর দশক থেকে আটের দশক—এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন দেশের অসংখ্য ওঠানামা— রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বলয়ে বিচিত্র-টানাপোড়েন ও পটপরিবর্তন। সময়ের সঙ্গে সব সময় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। ফলে তাঁর সমাজচিন্তা, রাজনৈতিক দর্শন বিবর্তিত হয়েছে— দেশাত্মবোধক জাতীয়বাদী গান্ধী নীতি পরিবর্তিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসে। তাঁর প্রথম পর্যায়ের নাটক নির্মাণের (১৯২৭-১৯৩৮)

মধ্যে উঠে এসেছে দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদী ভাবনা এবং স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাই যুগধর্মকে অস্বীকার করে নয়, অঙ্গীকার করে লিখেছেন। তবে লক্ষণীয় এই যে, তাঁর সর্ববিধ চিন্তা ও সৃষ্টির মূল কেন্দ্রে রেখেছেন মানুষকে, সবার উপরে স্থান দিয়েছেন মনুষ্যত্বকে, মানবতাকে। ১৯২৭ সালে আর্ট থিয়েটারের পরিচালক, নাট্যকার, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কর্ণধার হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি লেখেন পৌরাণিক শৈলীতে তিন অঙ্কের 'চাঁদ সদাগর' নাটক। পৌরাণিক কাহিনী কাঠামোর মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করেন আধুনিক মনন ও সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদ। মনসা ও চাঁদ সদাগরের বিরোধকে এ নাটকে প্রতিভাত করা হয়েছে বৃহত্তর শক্তির দ্বন্দ্বের প্রতীক হিসেবে। মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচারকে কেন্দ্র করে চাঁদ সদাগর ও মনসার বিরোধ ও তার ফলে চাঁদের জীবনে নেমে আসে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়— সপ্তডিঙ্গা মধুকর জলে তলিয়ে যাওয়া, ছয় পুত্রের মৃত্যু, লখীন্দরের মৃত্যু, মৃতস্বামীকে নিয়ে পুত্রবধূ বেহুলার কলার ভেলায় ভেসে যাওয়ার অনমনীয় তপস্যা— কিছুতেই চাঁদের অকল্পিত দৃঢ়তাকে আন্দোলিত করতে পারে না। দেবদ্রোহী চাঁদ সদাগরের বজ্রকঠোর অমিতবীর্য, অসম্ভব সাহস পাঠক এবং দর্শককে অবেগে উদ্বেল করে। বিদ্রোহী চাঁদের সংগ্রামী মনোভাব বহন করে আনে আধুনিক জীবনচেতনা। পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষ ও চাঁদ সদাগরের বিরোধের মধ্যে আভাসিত হতে দেখে শাসকের সঙ্গে শোষিতের দ্বন্দ্বের ছবি। এই প্রসঙ্গে সমালোচক ড. জয়তী ঘোষ তাঁর 'মন্মথ রায় : জীবন ও সৃজন' বই-এ যে মন্তব্যটি করেছেন তা উল্লেখ করা প্রয়োজন—

> ''মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে মানবিক সংগ্রামী চরিত্রের নাট্যরূপ। চাঁদ সদাগর দেবী মনসার বিরুদ্ধে যে কঠিন সংগ্রামী প্রতিজ্ঞা নিয়ে অটল চরিত্রশক্তির পরিচয় দিয়েছিল, বিংশ শতকের পরাধীন বাঙালী চরিত্রে সেই তেজ ও বীর্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন বলেই নাট্যকার সুদূঢ় পুরাণের পরিবর্তে বাঙালীর পুরাণকেই তাঁর প্রথম আদর্শ করেছিলেন।''[৯]

কিন্তু এই সবকিছু ছাপিয়ে এ নাটকে বড় হয়ে উঠে পৌরাণিক দেবী চরিত্রের আধুনিক মানবীকরণ। 'মনসা' হয়ে ওঠে নাট্যকারের অভিনব সৃষ্টি। চাঁদবেনে বেহুলা লখীন্দরের পুরোনো কাহিনীকে নতুন শৈলীতে মন্মথ রায় নতুন করে আধুনিক সংলাপে, চরিত্রায়ণের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উপস্থিত করলেন। বেহুলা প্রচলিত বিধি নিয়মকে অস্বীকার করে পরিচয় দেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির। আর মনসাকে মনে হয় বাংলার অবহেলিত নারীত্বের এক অশ্রুসজল প্রতিমা।

হাজার চেষ্টা করেও মনসা চাঁদের কাছ থেকে পূজা আদায় করতে পারে না। এই দুঃখে-কষ্টে -যন্ত্রণায় তার ঘুম আসে না। কারণ চাঁদ পূজা না করলে মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচলন হবে না। তবে মনসামঙ্গলের দেবী মনসার মতো এখানে মনসা সরাসরি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আসে না চাঁদের সঙ্গে। অপমান, দুঃখ, যন্ত্রণা, ঘৃণা পেয়েও পূজা পাওয়ার চেষ্টা করে। নাটকে দেখা যায়— মনসা পুত্র আস্তিকের সাহায্য নিয়েছেন। আস্তিক দেবীর পূজার অনুমতির জন্য সরাসরি চাঁদ সদাগরের কাছে যান। চাঁদের প্রাসাদ মন্দিরে দেবী চণ্ডীর মূর্তি দেখে সে ক্রোধে ফেটে পড়ে। যে চণ্ডীর সঙ্গে মায়ের বিরোধ, এবং যার কৃতকাজের জন্যে মায়ের কমল আঁখিতে আঘাত চিহ্ন, তার স্বর্ণমূর্তি দেখে ক্রোধিত হয় আস্তিক—

> ''সেই চণ্ডী... সেই চণ্ডীর স্বর্ণমূর্তি দেখে এলুম— তুষার মূর্তি শিবের বাম পার্শ্বে ...ঐ চাঁদ সদাগরের সিংহদ্বারের পূরোবর্ত্তী মন্দিরে। আমি ভেঙে এলুম না কেন সেই স্বর্ণ-মূর্ত্তি। আমি চুরমার করে দিয়ে এলুম না কেন রাক্ষসীর মিথ্যা প্রতিবিম্ব।''[১০]

নাটকে এই আস্তিক পর্বটি অভিনব সংযোজন করেছেন নাট্যকার। নেতা চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছেন অত্যন্ত নিপূণভাবে। মনসা যেখানে সরাসরি সংগ্রামে না গিয়ে মায়াযুদ্ধের দ্বারা চাঁদকে নিজের আয়ত্ত্বে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু অনেক সময় নেতাকে দেখা যায় মনসা পূজা প্রচারের জন্যে চাঁদকে চ্যালেঞ্জ করতে। মনসার পরামর্শদাত্রী এবং ভগিনী রূপে মধ্যযুগের মনসামঙ্গলকাব্যে নেতাকে পেয়ে থাকলেও আলোচ্য নাটকে নেতা হয়েছে মনসার সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসেবে কয়েকগুণ এগিয়ে। মনসার সঙ্গে কখনো 'সপ্তডিঙা মধুকর' ভাসিয়ে দেয়, আবার কখনো নিজে গোয়ালিনী বেশে ধন্বন্তরি ওঝার বাড়িতে দধি ভাণ্ডের মধ্যে সাপ রেখে আসে যা ওঝার প্রাণ নাশ করে। বেহুলার সঙ্গে কথোপকথনে নেতার মুখে যা শোনা যায়, তা আমাদের সাধারণ ঘরের নারীর পরিচয় দেয়—

> ''ভারি দরদ যে আমার পেটের ছেলে আমি বেশ করেছি, মেরে ফেলেছি, তোমার কি! মায়ের চেয়ে যে মাসীর দরদ দেখছি বেশী। আবার সে মাসীও যেমন--- তেমন মাসী নয়, কার মাথা খেয়ে এসেছেন। কে ওটি? কার হাড় চিবিয়েছ? সোয়ামী?''[১১]

ছলনা করে বেহুলাকে দেবসভায় নিয়ে যাওয়ার যে উদ্দেশ্য সেটি নাট্যকার অতি সাধারণ সংলাপের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। নেতা চরিত্রটি যেন নতুনভাবে উঠে এসেছে এখানে। নাটকে ধনা-মনার মতো লোভী চরিত্রও বিদূষকের মতো কাজ করেছে। ধন্বন্তরি বাবার ভক্তদের কাছ থেকে দক্ষিণার

ফলমূল নিজেরা খেয়ে ফেলে, আবার গোয়ালিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ব্যক্তিত্বহীন এই চরিত্র দুটি নাট্যঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে যা নাটকটিকে অন্যমাত্রা দান করেছে। নাটকে দেবী চণ্ডীর আবির্ভাব এবং চাঁদের সঙ্গে কথোপকথন, চাঁদকে সাহসপ্রদান ও প্রাসাদে মনসা পূজা হওয়ার জন্য দেবীর গৃহত্যাগ করা প্রভৃতি দৃশ্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। সেই সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়— নিছনিনগরের সাপের চিরন্তন শত্রু ময়ূরকে চমৎকার নাটকীয় কৌশলে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। নাটকে দেখা যায়— বেহুলার পিতা সায়বেনে নাকি মনসাপূজক এবং চাঁদসদাগরের সঙ্গে বেহুলার বিবাহের ব্যাপারে নাকি পূর্ব প্রতিশ্রুত ছিলেন। কালীদহে 'মধুকর' ডুবে যাবার পর পিতৃ-অন্বেষী লখীন্দর সায়বেনের কাছে নিখোঁজ পিতার সংবাদ পান। এই রকম অনেক নতুন তথ্য নাটকটির মধ্যে পাব। নাটকটিতে রয়েছে— রোমান্সের সূক্ষ্ম এক তন্তুজাল, যার বয়নটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে উদ্ভিন্ন যৌবন নর-নারী লখীন্দর ও বেহুলার প্রেমের পূর্বরাগে। লক্ষ্যযোগ্য চরিত্র হিসেবে নাট্যকার এখানেই গড়ে তুলেছেন সদ্য তরুণ লখীন্দরকে। লখীন্দর এ নাটকে দৈব-দুর্যোগের অসহায় বলি হয়েই কেবল দেখা দেয়নি, তার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে প্রেম বুভুক্ষু এক পুরুষ সত্তা। নাটকে মানস কাহিনী উপস্থাপনা ও ঘটনা বয়ন কৌশলের মধ্যে অভিনবত্ব এনে সেই সঙ্গে মিথের নতুনত্বের ব্যাখ্যা নাটকটিকে অন্য মাত্রা দান করেছে। নাটকের শেষের অঙ্কে আমরা যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপে শিবের আবির্ভাব এবং মনসার পূজা করা হল তারই পূজার নামান্তর, মনসাকে নিজের আত্মজা বলে স্বীকৃতি ইত্যাদি নতুনতর ব্যাখ্যায় নাট্যরস চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। প্রাচীন কাব্যের মতো শর্তারোপের পথে নয়, নাট্যকার চাঁদকে দিয়ে মনসাপূজা করিয়ে নেওয়ার যে ভিন্ন কৌশল নাটকটিকে মনসামঙ্গল কাব্যের এক নতুন নাট্যরূপ হিসাবে দেখা যেতে পারে। মনসাদেবী সম্পর্কে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সমালোচক সনৎকুমার নস্কর তাঁর 'প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা' গ্রন্থে যে বক্তব্য রেখেছেন তা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—

> ''নাটকের উপান্তে মনসাচরিত্র পূর্বের ক্রুরভাব কিছুটা বদলে স্নেহময়ী ও ক্ষমাপ্রবণ হয়ে উঠেছে। বেহুলার অপরিসীম দুঃখ অনুভব করেই বোধহয় মনসার এ পরিবর্তন।''[১২]

চাঁদের কাছে পূজা প্রচারের আবেদন রাখলেও, তাকে মায়াজালে বিপদে ফেললে তাঁর দুঃখে দুঃখিত হয়েছেন। তাই নেতার সামনে অনায়াসেই বলতে পারেন— পূজা আমার চাইনে, চাঁদ বেঁচে উঠুক এটাই চাই। সদ্য বিবাহিতা, স্বামীহারা বেহুলার একনিষ্ঠতায়, পাতিব্রতায় মুগ্ধ হয়ে লখীন্দরের জীবন ফিরিয়ে দেন। চাঁদের প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে নিয়তিকে অস্বীকার করার যে পন্থা, দেবী মনসার

কাছে আত্মসমর্পণ নয় বরং ছলে বলে দেবী মাহাত্ম্য মানিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ— যাই হোক না কেন ? সবকিছুর ঊর্দ্ধে মানবতার জয়গান ঘোষিত হয়েছে নাটকের মধ্যে। তাই এখানে পৌরাণিক নাটক হয়ে উঠেছে আধুনিক নাটক। সেই সময়ের পরাধীন ভারত জীবনাকাঙ্ক্ষাই যেন ফুটে উঠেছে। ভক্তি বিশ্বাসের পথে নয়— তাঁর আগে যে দুজন নাট্যকার পুরোনো পথ ত্যাগ করে তাঁদের নাটকে মানবিক চেতনার যে ধারা আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন সেই ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চেতনার ধারাটাই মন্মথ রায় আরও প্রসারিত করেছিলেন। মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের কাব্যের বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করে নাটক রচনা করতে গিয়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটিয়ে অভিনব নাটকের সৃষ্টি করেছেন। 'চাঁদ সদাগর' নাটকটি নাট্যকারের ভাবনায় যেমন, তেমনি প্রকরণের দিক দিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের আধুনিক রূপায়ণ হয়ে উঠেছে।

মনসা দেবীর মিথকে গ্রহণ করে মন্মথ রায়ের 'চাঁদসদাগর' নাটকের পরে নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক **অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সওদাগরের নৌকা'** (১৯৭৬) নাটকটি আমরা পেয়ে থাকি। এই নাটকে মনসা কথার মিথ কীভাবে রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। তবে প্রথমে নাটকার সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

বাংলা নাট্যশিল্প ও নাট্যমঞ্চের জগতের অন্যতম বিস্ময়কর প্রতিভা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৮৩) মানভূম জেলার বোপো গ্রামে ১৯৩৩-এর ৩০ শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। কুলটি হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আসানসোল কলেজে আসেন আই.এ. পড়ার জন্য। এখানেই তাঁর নাট্যজীবনের গোড়াপত্তন হয়। পরে কলকাতায় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে বি.এ. পড়ার সময় ১৯৫৬ সাল থেকে গণনাট্য সংঘের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯৬১ সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। এই পর্বে তিনি 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামে একটি নাটক রচনা ও নির্দেশনা করেন। ১৯৬০-এর ২৯ শে জুন গণনাট্য সংঘের একটি শাখা হিসেবেই তিনি গড়ে তোলেন 'নান্দীকার' নাট্যসংঘ। এই নাট্যসংঘকে কেন্দ্র করেই তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিস্ফুটন ঘটে। এই সময় তিনি বহু মৌলিক নাটক এবং রূপান্তরিত নাটক রচনা ও পরিচালনা করেন। এগুলির মধ্যে আছে— 'সেতুবন্ধন', 'সওদাগরের নৌকা', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'শের আফগান', 'তিন পয়সার পালা', 'বীতংশ', 'নটীবিনোদিনী', 'শাহী সংবাদ', 'ভালোমানুষ', 'মুদ্রারাক্ষস', 'হে সময় উত্তাল সময়' প্রভৃতি নাটক। এছাড়া 'অগ্নি বিষয়ক সতর্কতা', 'ফুটবল' ইত্যাদি নাটক কোথাও নির্দেশনা ও অভিনয়, কোথাও বা শুধু নির্দেশনা বা শুধু অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নান্দীকারে থাকাকালীন তিনি

অন্যান্য যে সব নাটকের নির্দেশনা বা অভিনয়ে যুক্ত হয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— 'অন্ধযুগ', 'একটি রাজনৈতিক হত্যা', 'বাঘিনী', 'থানা থেকে আসছি', 'এই অরণ্যে' ইত্যাদি। তাঁর পরিচালিত ও অভিনীত 'নাট্যকারের সন্ধানে ৬টি চরিত্র' অভিনয় নিয়ে মূল সংস্থার সঙ্গে বিতর্কের ফলে ১৯৭৭-এর ৯ই সেপ্টেম্বর 'নান্দীকার' থেকে বেরিয়ে 'নান্দীমুখ' নামে স্বতন্ত্র নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তাঁর রূপান্তরিত, নির্দেশিত ও অভিনীত শেষ অসামান্য অবদান তলস্তয়-এর 'পাওয়ার অব ডার্কনেস' অবলম্বনে রূপান্তরিত নাটক 'পাপপুণ্য'।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যগীত রচনা এবং সুরসৃষ্টিতে যে অনায়াস দক্ষতা ছিল তা তিনি প্রমাণ করেছেন— 'তিন পয়সার পালা', 'হে সময় উত্তাল সময়', 'ভালোমানুষ', 'আমরা সবাই যাবো কুল পাড়তে', 'ইচ্ছা' ইত্যাদি নাটকে। তিনি যে মঞ্চ সজ্জাতেও হাত লাগিয়েছিলেন তার প্রমাণ 'পরিণীতা' নাটকটি। এই নাট্যকর্মের পাশাপাশি তিনি উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প ইত্যাদিও লিখে গেছেন। কর্মজীবনের প্রথম পর্বে তিনি দুটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নাট্যকর্মে নিবেদিত করেন। যদিও বেশ কয়েকটি হিন্দি ও বাংলা চলচ্চিত্র, এমনকি যাত্রাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তবুও তাঁর প্রথম ও একমাত্র প্রেম ছিল বাংলা নাট্যমঞ্চ। তিনি সংগীত ও নাটক অ্যাকাদেমির পুরস্কার ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মস্কো নিউজ ক্লাব, ক্রিটিক সার্কল অফ ইণ্ডিয়া, দিশারী, বঙ্গসভা ইত্যাদি বহু সংস্থা কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তিনি আবার চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে এই অসামান্য অভিনেতা, নির্দেশক ও সার্বিক নাট্যকর্মীর ব্যস্ততম কর্মজীবনের উপর আকস্মিকভাবে ছেদ পড়ে ১৯৮৩-র ১৪ই অক্টোবর।

'চাঁদ বণিকের পালা' (১৯৭৮) নাটকে নাট্যকার শম্ভু মিত্র যেমন মধ্যযুগের কাহিনীকে অনুসরণ করে বর্তমানের সমস্যাদীর্ণ মানবসভ্যতার মূল্যায়ন করেন, প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তার আগেই সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি করেন আর এক নতুন মঙ্গলকাব্য— 'সওদাগরের নৌকা' (১৯৭৬, ৩০ শে অক্টোবর) তিনি মনসা-পুরাণের কাব্যাদর্শকে ব্যবহার করে প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে গড়ে তোলেন নাট্য শিল্পের এক নতুন আদর্শ। তাঁর 'সওদাগরের নৌকা' অভিনয়ের এক মহান চরিত্রের বেদনাময় পরিণতি নিয়ে রচিত নাটক হয়ে ওঠে নিজস্ব এক সময়ের দর্পণ। বাংলা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের নেতা, নাট্যশিল্পের সর্বক্ষণের কর্মী ও আপোষহীন সংগ্রামী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সওদাগরের নৌকা' নাটকটি রচনা করেন বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বিধ্বস্ত সময়ের পটভূমিকায়। 'নান্দীকার' প্রযোজিত পূর্ণাঙ্গ এই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৭৬

খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর। বাংলা অ্যাকাদেমিতে অভিনীত এই নাটকের প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নাট্যকার নিজেই। নাটকটিতে প্রসন্ন চরিত্রকে কেন্দ্র করে মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ চরিত্র উঠে আসে। সেখানে মনসামঙ্গল কাব্যের পুনর্নির্মাণ না হলেও মঙ্গলকাব্যের চাঁদ সওদাগরের অনুসঙ্গে নির্মিত হয়েছে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। মূল নাটকের ক্ষেত্রে কোন অঙ্ক বিভাজন আমরা দেখি না, প্রচলিত রীতি না মেনে টানা একটি দৃশ্যে নাটকের কাহিনী এগিয়ে গেছে। মূল চরিত্র প্রসন্ন, তার স্ত্রী সতী, ছেলে কালো, এছাড়া আশা, হরিসাধন, মাধব গড়াই, প্রতিবেশিনী, কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি চরিত্র। নাটকটিতে বৃদ্ধ প্রসন্নব নিম্নবিত্ত সংসারের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। নাটকের শুরুতেই আমরা চাঁদ সদাগরের অনুষঙ্গ দেখতে পাই। বৃদ্ধ প্রসন্ন তার নিজের ঘরে ঢুকতে মাথা নিচু করতে নারাজ। কারণ চাঁদ সদাগর কখনো কোনদিন মাথা নিচু করেননি। তাই একসময়ের যাত্রাদলের অভিনেতা যিনি কিনা চাঁদ সদাগরের ভূমিকায় অভিনয় করতেন, নিজেকে এখনো চাঁদ সদাগরের সঙ্গে একাত্ম মনে করেন; চাঁদের দৃঢ়তা, বলিষ্টতা পৌরুষত্বকে আত্মস্থ করতে চান, চাঁদ সদাগরের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে অনুভব করেন তাই অনায়াসেই তার মুখে শোনা যায় যখন স্ত্রী মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকতে বলে— ''মাথা নীচু করলে বড়ো লাগে। চাঁদ সদাগর কিনা মাথা নীচু করেনি।''[১৩] এভাবেই আমরা লক্ষ্য করি যে প্রসন্নর চেতনায় মঙ্গল কাব্যের মিথিক্যাল আদর্শ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। দীর্ঘ দিনের অভিনেতা প্রসন্ন পালাগানের আসরে রাতের পর রাত মঙ্গলকাব্যের চাঁদ সওদাগরের চরিত্রে অভিনয় করে হাজার হাজার মানুষের মনোরঞ্জন করেছে এবং এর মধ্য দিয়ে নিজের অজান্তে কখন চাঁদ সওদাগর হয়ে উঠেছে জানে না। তার প্রত্যেকটি কথায়-বার্তায়, কর্মে ভাবনায়, আচার-আচরণে অতীতের স্মৃতি ভেসে ওঠে। অভিনয় করতে করতে বৃদ্ধ বয়সেও সে অভিনয়ের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। নিজের জীবন-যৌবন ফিরে পেতে চায়। পাগলাগারদে থাকা জীবনের অন্ধকারময় সময় ভুলে নতুন করে জীবন শুরু করতে চায় সে। চুলে কলপ লাগিয়ে নিজের বয়স কমাতে চায়। চাঁদ সওদাগরের মতো বৃদ্ধ বয়সেও সে নিজেকে ব্যর্থতার পথে যেতে দেয় না। নিজের মধ্যে আবার হারিয়ে যাওয়া উদ্যম খুঁজে পেতে চায়, পালাগানে চাঁদ সদাগরের ভূমিকায় অভিনয় করতে চায়। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে চাঁদ চরিত্রের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য খুঁজে পেতে চায়। এখানে আমরা দেখি, প্রায় অথর্ব হয়ে পড়া প্রসন্নর হৃদয়ে ভিড় করে আসে অভিনয় জীবনের নানা ঘটনা। জীবনের সাফল্যময় দিনগুলি হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণায় মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তীব্র অসহায়তা ও হাহাকার বুকে নিয়ে অনুভব করে— অভিনয় তার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। সেই অভিনয় জগতের চরিত্রের সংলাপই তার অন্তরের ভাষা, তার

মানসিক আশ্রয় হয়ে ওঠে। তাই অতীত জীবনে বহু অভিনীত চরিত্রগুলির অনুজ্জল ও জীর্ণ পোশাকগুলি ঘরের দড়িতে মেলে ধরে। নাট্যকারের ভাষায় উঠে আসে—

> ''সম্প্রতি তিনি একজন ক্লান্ত নাবিকের মতো দড়িটা কাঁধে নিয়ে এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়ালে পোশাকগুলি আটকে দিচ্ছেন।''[১৪]

অভিনয়কে ভালোবেসেছিলেন বলেই অভিনয় জগতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে সারাজীবন কাটাতে চায়। যার ফলে বাস্তব জগতকে উপলব্ধি করতে, নিজেকে বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে খুব কম পেরেছে; সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাওয়া পাওয়ার হিসাব তিনি কখনোই করতে পারেনি। তার সংসারে ছায়া ফেলেছে চরম দারিদ্র্য ও অসম্পূর্ণতা। ঘর-বাড়ি, জমি-জমা, টাকা-কড়ি, কিছুই করতে পারেনি। পারেনি স্ত্রীকে সুখী করতে। একমাত্র সন্তান কালোকে মনের মতো করে মানুষ করতে পারেনি। ম্যাট্রিক পাশ করা, ইংরেজি জানা প্রসন্ন শুধুমাত্র পাগলামির নেশার জন্য মানুষের কাছে সমীহ পায়নি, কোন সম্মান পায়নি। তবুও প্রসন্ন আশার আলো দেখতে চায়। হবু পুত্রবধূর সেবাযত্ন পাওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়, যা উদ্দীপকের কাজে লাগবে। বৃদ্ধ প্রসন্ন আবার আসরে নেমে, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে লোককে হাসিয়ে-কাঁদিয়ে মাতিয়ে তুলবে। অন্যদিকে আবার নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে সে। কল্পনার জগতে বিচরণ করতে চায় না। নিজের জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন করে জীবন সম্পর্কে যে, মানুষ কেন দিবাস্বপ্ন দেখে? মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক। দিবাস্বপ্নের বজ্রধ্বনিতেই সে উন্মাদ হয়ে পড়ে, স্বপ্নের পতঙ্গ তাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়, প্রসন্নে থাকতে চায়। আরো পাঁচজনের মতো তাস খেলে, জোরে হেসে, মড়া পুড়িয়ে, পুজো-উপবাস করে সে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু বর্শার ফলার মতো সজীব স্বপ্ন তাকে বারবার বিদ্ধ করে যন্ত্রণার অশ্রুতে মাখিয়ে তাকে ভিজিয়ে রাখে, তা থেকে কোন নিস্তার নেই।

পুত্র কালোর মধ্যেও এক আত্মসংকট ও আত্মজিজ্ঞাসা দেখা দেয়। বাস্তব জগতের সত্যগুলিকে অনুভব করে সে নিজের জীবনের অগ্রগতির প্রতি সন্দিহান। বেঁচে থাকার জন্য সে বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে চায়। সমাজের যারা অন্য লোকের ভালো করার কথা বলে, তারা নিজেরাই আখের গোছাতে ব্যস্ত থাকে। দেশে এমন কোন লোক নেই যে অন্যকে খেতে পরতে দেবে। কারণ একটা ভুঙা নাঙ্গা লোক সে আরেকটা লোককে কীভাবে খেতে পরতে দেবে। মানুষের মূল্যবোধ, আত্মসম্মান, আত্ম মানবতার থেকে অর্থই যে সব থেকে বড় মানুষের কাছে তা কালোর বক্তব্যে স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে। লেখাপড়া করতে না পারার যন্ত্রণা, জীবনে সুখ না পাওয়ার যন্ত্রণায় তার মন ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। উচ্চ বংশের ছেলে হয়েও কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে, বেশি

টাকার লোভে ওভারটাইমও করে সে। তার মতে বাঁদর নাচানোতে সবচেয়ে বেশি টাকা হলে মানুষের কাছে বাঁদর নাচানোই সবচেয়ে সম্মানের কাজ। নিজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ভেবে মরিয়া হয়ে ওঠে কালো এবং মাকে বলে—

> ''মা, তুমি আমাকে কেন জন্ম দিলে, মা? যদি দিলে তাহলে কেন এমন করে মুখ্য করে, গরিব করে এমন নোংরায় আমাকে বড়ো হতে দিলে! মা, না হয় বামুনের ছেলে হয়ে, পুজো করে সারাজীবন খেয়ে বেড়াতুম। কিন্তু এ কী হল! এ যে পুরোনোটাও ছাড়তে পারি না, নতুনটাকেও বিশ্বাস করতে পারি না। আমি যা, আর যা হতে চাই—এ দুটোতে যে দু-দিক ধরে ধরে ছিঁড়ছে আমাকে।'' [১৫]

নাটকটিতে অনেক ক্ষেত্রেই কালোকে মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগরের পুত্র লখীন্দরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নাট্যকার মধ্যযুগের সাহিত্যের লখীন্দর চরিত্রকে মাথায় রেখেই কালো চরিত্রের নির্মাণ করেছেন, একথা নিঃসন্দেহ। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য পিতাকে দায়ী করে কালো, অনায়াসেই পিতাকে পাগলাগারদে পাঠিয়ে দেয়; এমনকি, পিতার উপরে হাত তুলতেও পিছপা সে হয় না। এই সমস্ত হতাশাময় অভিব্যক্তি ও আচরণ যখন সংসারের বুকে আছড়ে পড়ে তখন তা শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি থাকে না, তা সাতের দশকের অস্থির সময়ের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকা যুবসমাজের অন্তরের হাহাকার হয়ে ওঠে। শেষে কালোর পিতৃবিদ্বেষী মনোভাবের পরিবর্তন হয়। নিজের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়, পিতার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। লখীন্দরের মতোই জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও অস্তিত্বের সংকটে পড়ে কালো। এটা আসলে বিশ শতকের সাতের দশকের বিপন্নতাই যেন তরুণ সমাজের সামনে অস্থিরতা, যন্ত্রণা, ক্ষোভ ও অভিমান হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আর এই সময়ের সংকটকে তুলে ধরতে গিয়ে কালো চরিত্রের নির্মাণ করেছেন শিল্পী।

মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের 'সপ্তডিঙা মধুকর ডুবে' যায়, ছয় পুত্রের মৃত্যু ঘটে, সপ্তম সন্তান লখীন্দরকে সর্পে দংশন করে। সবকিছু হারিয়েও চাঁদ আত্মশক্তিতে অটুট থাকেন, নিজেকে হারিয়ে দেয় না। পুনরায় সচেষ্ট হয়— পাড়ি দিতে, বাণিজ্যের নৌকা ভাসাতে। এই আদর্শ ও ব্যক্তিত্বে অটল চাঁদ প্রতীকীরূপে প্রসন্নর কাছে হয়ে ওঠে আদর্শ। চাঁদ বণিক যেমন নতুনকে গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়, তাই আরাধ্য দেবতা শিবকে ছেড়ে লৌকিক দেবী মনসার পূজা করতে নারাজ। প্রসন্নও যাত্রাদলের সঙ্গী হরিসাধনের কাছে মেয়েদের যাত্রা করার কথায় চমকে ওঠে। তৎকালীন মেয়ে মানুষের চরিত্ররক্ষার চেয়ে জীবন ধারণই যে মুখ্য তা হরিসাধনের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক স্বদেশী যাত্রা সমস্ত স্তিমিত হয়ে গিয়ে এসেছে নবযুগ। যত দ্রুত পাল্টানোর কথা তারও থেকে অনেক তাড়াতাড়ি পাল্টাচ্ছে। অত্যন্ত আশঙ্কার সুরে প্রসন্নর মুখে শোনা যায়—

> ''মহাকাল রথে আসেন, চাকার ঘর্ঘর শুনে যদি বরণমালা নিয়ে পথের পাশে দাঁড়াও তো টিকলে, নয় স্পর্ধা করে রুখতে যাও তো বুকের পাঁজরা গুড়িয়ে দিয়ে যাবে রথ।''[১৬]

এতকিছুর মধ্যেও নিজস্ব মনোবল হারায় না প্রসন্ন। তাই পুনরায় সে বন্ধু হরিসাধনের কথায় মাধব গড়াই-এর যাত্রাদলে চাঁদ চরিত্রের অভিনয় করতে চায়। যাত্রাদলের লাইনে পাগল বলে তার দুর্নাম রটে গেলেও আসরে দাঁড়ালে আবার অমনি করে আসর কাঁপিয়ে দিতে পারে বলে তার আশা। বর্তমানকে ভালোবেসে পুনরায় ভবিষ্যতের ওপর ভরসা করতে ইচ্ছে করে, আশা-আনন্দে ভরে ওঠে, মন ভালো হয়ে যায়। তার এই অনুভূতি, চাওয়া-পাওয়া ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে বিশ্বানুভূতিতে পরিণত হয়। প্রসন্নর উক্তিতে তাই উঠে আসে—

> ''আমি থাকব না তাতে কী? মানুষ থাকবে। যতদিন আমার ভোগ ছিল আমি ভোগ করেছি, এখন আমার গান গাওয়ার পালা ফুরিয়েছে এখন অন্য কবি গান গাইবে। তানপুরোটা তার হাতে তুলে দিয়ে বাকি রাতটুকু অন্ধকারে বসে তার গান শুনে কাটিয়ে দেব।''[১৭]

তবে সাধারণ মানুষের মতো সে নিজেকে হারায়, নিজেরই কাছে। অন্তরের শুভ রাম আর অশুভ রাবণ তার মধ্যে প্রতিনিয়ত খোঁচা মারতে থাকে। নিজেকে স্বার্থপরের মতো ভালোবাসে বলেই শুভর জয়বার্তা যা মানুষের চিরকালের বাণী, তাকে হারায়। তাই সারাজীবন শান্তি পায়না অথচ খুঁজে মরে চিরকালটা। চিরকালের সব মানুষের মতো সেই সার্থকতার তীর্থে চিরকালের যাত্রী বলে ধ্বংসের ধারালো খড়্গের সামনে থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না। তবুও যখন মনের আলো ঝলকায় তখনও আহত দেহে, রক্তাক্ত শরীরে, চোখে চাবুক খাওয়ার আরবি ঘোড়ার মতো সে লড়াই করে। নিজে ক্ষয় হতে হতেও মিথ্যার দশ আঙুলে কণ্ঠনালী ছিন্ন হতে দিয়েও সত্যের জয়গান করে। চাঁদ সদাগর একসময় যেমন পাগল হয়ে বনে বনে ফেরেন দেবী মনসার সঙ্গে বিরোধিতায় গিয়ে, নাটকেও যাত্রাদলের অভিনয়ের নেশা প্রসন্নকে পাগল করে ছাড়ে। মনসামঙ্গল কাব্যে যেমন দেখি চাঁদ সদাগর সবকিছু হারিয়ে একসময় হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন, নিজের দুর্দশার জন্য নিজেকেই দায়ী করেন। সন্তান-সন্ততিদের হারিয়ে, ধনসম্পত্তি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। 'সওদাগরের নৌকা'

নাটকের প্রসন্ন চরিত্রের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি লক্ষ করি। নিজেকে দায়ী মনে করে সে। যতটা বিদ্যে সে আহরণ করতে চেয়েছে অথচ কাজে লাগায়নি কিছুই। তার এটাই দুঃখ যতটা কাজ ও ক্ষমতা ছিল এই বিদ্যেকে কাজে লাগানোর তা করতে উঠতে পারেনি। সেই সঞ্চিত পুঞ্জিভূত বিদ্যে নিজের মধ্যে অব্যবহৃত দাহ্যশক্তির মতো অগ্নিক্রিয়া করে তাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে সম্পূর্ণ মানুষ, স্বাভাবিক মানুষ হয়ে থাকতে পারেনি। হারিয়ে যাওয়া সোনালী দিনগুলি ভেবে আনন্দে-দুঃখে মন ভরে ওঠে। জীবনের পরিপূর্ণতা না চেয়ে প্রতাপ চেয়েছিল সে। হয়তো একচক্ষু হরিণের মতোই গর্বিত ছিল, তাই প্রতিযোগিতার মৃত্যুবাণে মারা পড়ল সে। নবযুগের পথিকদের সঙ্গে পুরনো দম্ভ নিয়ে লড়তে গিয়েছিল, শেষে নিজেই পাগল প্রমাণিত হল। তার মতে বর্তমানের মজে যাওয়া, মরা, ধসা সময়ের সাগরের বালিয়াড়িতে তার মন জ্বলে শেষ হয়ে গিয়ে শুধু শরীরটা বেঁচে রয়েছে। ভালো হতে চেয়েও পারেনি। পাঁচজনের মতো হতে চেয়েও নিজেরই অজান্তে পাঁচজনের থেকে অনেক অনেক দূরে সরে এসেছে হারতে হারতে। এতদিন ধরে ভাবনা ও কিছু করার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখতে পায়, কোন মিলই নেই। তাই তার মনে হয় বেঁচে থেকেও বন্ধু সাধনের মতো মরে গেছে।

নাটকের শেষে দেখা যায় নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে এবং অনেকটা অর্থের তাগিদে কালিকৃষ্ণের 'নব যুগ অপেরা'য় 'চাঁদ সদাগর' যাত্রাপালায় কমিক চরিত্র গোদামালোর ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজি হয়। কালের নিয়মে নায়ক হয়ে পড়ে বিদূষক। প্রসন্নর মতে, মহাকাল নায়কের সাজ খুলে ফেলে দিয়ে মুখে অনেক বলিরেখা এঁকেছেন যে, এতাবৎ কাল তাকে স্বচ্ছন্দে বিদূষক মানায়। বিদূষকের অভিনয় করতে করতে তার মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হলেও আসরের মধ্যে হাততালি বেজে ওঠে সার্থকতার অধ্যায়ে। তবুও সে নিজে বাঁচার জন্য, ছেলের অভিশাপ থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য যাত্রাদলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। প্রসন্ন তার স্ত্রীকে নিয়ে একসঙ্গে বাঁচার দুর্মর প্রত্যাশায় এবং রোজগার করতে পারলে কালোও তাদেরকে 'মান্যি' দিবে এই ভেবে আবার কাজে যায়। কারণ জীবনে যা কিছু মানুষ চাই সবই টাকার মধ্যে প্রতীকে আবদ্ধ হয়ে আছে। এখানে আমাদের ফিরে যেতে হয় মনসামঙ্গলের শেষের দৃশ্যে। সেখানে চাঁদ যে অসহায়ের মতো কনিষ্ঠ পুত্রবধূ বেহুলার পরামর্শে বাম হাতে হলেও মনসার পূজা দিতে বাধ্য হন, এখানেও তেমনি সময়ের ব্যবধানে 'চাঁদ সদাগর' থেকে 'গোদা' চরিত্রের অভিনয় করতে হয় প্রসন্নকে। আশার আলো তবুও দেখা যায় যখন স্ত্রী সতীর মুখে শোনা যায়—

''তুমি ভালো করে কাজ করলেই আবার চাঁদ সাজতে পারবে একদিন

না একদিন।”[১৮]

নাটকে দেবী মনসাকে লৌকিক দেবী, সাধারণ মানুষের দেবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেশিনী কন্যা ও প্রসন্নর হবু পুত্রবধূ আশার কাছে মনসা যেন মানুষের মতো জেদি, অন্য ঠাকুর দেবতার মতো না। আশার বক্তব্যে কথাটি ফুটে উঠেছে এভাবে—

‘‘মনসাকে আমার ভালো লাগে না, কেমন যেন। ... কেমন জেদি,
কেমন ঠাকুর দেবতার মতো না, কেমন যেন মানুষের মতো।”[১৯]

আবার প্রসন্নর দৃষ্টিভঙ্গিতে মনসা চরিত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে অন্যভাবে। মনসা যে সাধারণ মানুষের দেবতা তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। প্রসন্নর মুখে খুব যুক্তিপূর্ণ ও সমাজনির্ভর মনোভাব প্রতিষ্ঠা করে জানান মানুষই ভেবেছে মনসাকে। আর সব দেবতারা সাবেকি, মনসা নতুন ঠাকুর। অন্য দেবতাদের কল্পনা করেছে ব্রাহ্মণ ঋষিরা, মনসাকে কল্পনা করেছে লোকেরা। তার যে মানুষের মতো ব্যবহার, দেবতার এই কল্পনাই যুগসন্ধিক্ষণে মানুষের নতুন স্বর্গ কল্পনা। এ যে প্রচণ্ড শক্তির মানুষের সঙ্গে অল্প শক্তি মানুষের কল্পনা। ফলাফল নিশ্চিত। তবু চাঁদ যখন দেহের শক্তিতে হারেন তখন মনসাও আত্মার শক্তিতে হেরে তার সমান হন। তখন সে হেরেও তারই জিৎ। এইভাবে নাট্যকার মিথের ঐতিহ্যকে আজকের মানুষের চরিত্র মহিমার সঙ্গে মিলিয়েছেন। মনসার পরিচয় দুইভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন নাট্যকার।

চাঁদ প্রসন্নর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ চরিত্রের আইডিয়া ও আদর্শের মিল খুঁজে পাওয়া যায় নাটকে, সেখানে চাঁদের সঙ্গে তাকে পৃথক করা যায় না। নাটকটি আরো জীবন্ত হয়ে উঠে সেই মধ্যযুগীয় বাণী যখন ভেসে ওঠে ‘সওদাগর, নৌকা ভাসাও’। শেষ বয়সে প্রসন্ন বিরাট গাঁয়ে যে অভিনয় করতে যায়। সেখানে সন্ধ্যের পরে খেয়েদেয়ে হ্যারিকেন হাতে আলের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এসেছে হাজার হাজার লোক। অসময়ের মেঘ ও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে যেন ধ্বনিত হচ্ছে এই একটাই কথা— যে কথা শুনে মানুষ বারবার পাগল হয়ে ঘর ছেড়েছে, যে কথা আসরে মানুষের মনে মাঠে ঘাটে, শিশিরে ঘাসের পাতায়, রাতের পাখিদের বাসায় বাসায় জাগ্রত পাহারাওয়ালার চোখের পাতায় শিহরণ তুলে— ‘সওদাগর, নৌকা ভাসাও’-এর সঙ্গে সঙ্গে সাপের বাঁশি বেজে ওঠে, দুলতে থাকে শঙ্খচূড়ের নাচের তালে হিংস্র ঘরছাড়ানো সুর। প্রিয় জনেরা যেন বলতে থাকে— ও লখীন্দরের মা, তোমার স্বামীকে বোঝাও। সাত-সাতটা ছেলে যে তোমার মনসার রোষে মরেছে সপ্তডিঙার মারণলীলায়, ঘরে তার সাত-সাতটি পূর্ণ যৌবনা পুত্রবধূ। মনসামঙ্গলের আবহ রয়েছে নাটকটির পরতে পরতে। কাহিনীর পরিণতিতে দেখি নাট্যকার অদ্ভুত এক সাংকেতিকতার পরিমণ্ডল

তৈরি করেন। সেখানে কম্পিত ঢেউ-এর উপর ভেসে ওঠে নৌকা, সুদীর্ঘ অতীত আছড়ে পড়ে বর্তমানের পরিসরে। প্রসন্নকে মনে হয় 'চাঁদ' এবং তার স্ত্রীকে মনে হয় 'সনকা'।

কাহিনীর এই পরিণতিতে যাওয়ার জন্য অবশ্য নাট্যকার সূচনা থেকেই গভীর আবেগধর্মী পরিমণ্ডল তৈরি করেছেন। শিল্পী প্রসন্নর জীবনের পূর্ণতা খোঁজা তার অভিনয় জগতের মধ্যেই। তাই প্রসন্ন শিল্পকে আঁকড়ে বাঁচতে চায়। একদিন শিল্পের মধ্যে দিয়েই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চায়। অতীতে অভিনীত চরিত্রের অনুজ্জ্বল পোশাকগুলি সাজাতে সাজাতে তাই মগ্ন হয়ে পড়ে। সেই সব জরি আর ভেলভেটের পোশাক আঁকড়ে ধরে ক্লান্ত নাবিকের মতো পথ খোঁজে। নাগিনীর ছোবলের মৃত্যুকে আটকানোর চেষ্টা করে। নতুন করে বাঁচার অবলম্বন খোঁজে। প্রসন্ন যেমন বন্ধু হরিসাধনের কাছে অনুতাপ করে বলে যে— আবার সেই রঙিন ঘরে, সেই চলচ্চিত্র দিয়ে ছাওয়া চন্দ্রাতাপের নিচে, ময়ূরপালকের মতো বিচিত্র আসরে, সব উৎকণ্ঠিত বিচিত্র চোখের সামনে চরিত্র সেজে দাঁড়ানোর দিন কি আর ফিরে আসবে। এই বিষণ্ণতা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে পালাগান অভিনয় করতে যায়। মাধবগড়াই-এর সঙ্গে চুক্তি করে চল্লিশ টাকা সম্মানী ও দেড় টাকা জলখাবারের বিনিময়ে আসানসোল থেকে মধুতটি হয়ে চিনাসুর অতিক্রম করে তেরো ক্রোশ দূরের গ্রামে 'চাঁদ সদাগর' পালায় চাঁদের চরিত্রে অভিনয় করতে যায়। এইভাবে শিল্পী প্রসন্নকে একদিন চলে যেতে হয় পালাগানের আলোকিত জগৎ পাওয়ার উদ্দেশ্যে। আসলে নাট্যকার বোঝাতে চেষ্টা করেন যে শিল্পীদের কোথাও ধরে রাখা যায় না। যারা শিল্পী জীবনের আলোকিত পথের যাত্রী তাদের চাঁদ সদাগরের মতো এককভাবে পাড়ি দিতে হয়। তাই কাহিনীর অন্যতম এক চরিত্র কালীকৃষ্ণের কথায় প্রসন্ন পালাগানের জন্য নিরুদ্দেশের স্রোতে ভাসতে যাত্রা করে। অসহায়ভাবে পড়ে থাকে স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর সংসার। সে চাঁদ বণিকের মতোই জীবন সমুদ্রে সওদাগরের নৌকা ভাসায়। স্ত্রী সতীকে বলে—

> ''বড়ো বউ, শুনতে পাচ্ছ, ময়ূরপঙ্খী দুলছে? নাগিনীর মতো ঢেউ উঠছে ফুলে ফুলে, পালে দক্ষিণের হাওয়া লেগে সামুদ্রিক জলচরের পেটের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠেছে। আমার চারিদিক থেকে মহতী ধ্বনির বেগবান গান উঠছে প্রকম্পিত হয়ে, সেই আদিমতম পরমতম ঘর ছাড়ার ডাক 'সওদাগর, নৌকা ভাসাও—''[২০]

নাটকে কালিকৃষ্ণের মুখে শোনা যায় যে এবার তবে, সওদাগর নৌকা ভাসাও। এই হার-জিতের পার্থক্য হারিয়ে যাওয়া জীবন যেন চাঁদ সদাগরের সমুদ্রে যাত্রা। এই অকূল পাথারে যাত্রার আবেগ আরো ঘনীভূত হয় যখন তার স্ত্রী সতী বলে সে কখনোই একা থাকবে না— একথা ভেবে স্বামী

প্রসন্নকে খুশী থাকতে বলে। বর্ষার জন্য জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে পুরানো কালের মতোই, অনেকদিন ধরেই অনেক কাল ধরেই, অনেক সময় ধরেই। প্রসন্ন ও সতীর এই মনোভাব ও অফুরন্ত আবেগ যখন ঝরে পড়ে তখন এই দুই চরিত্র যেন হয়ে ওঠে পুরাণের চরিত্র। তারা যেন মনসামঙ্গলের পরাজিত, ব্যর্থ অথচ আপন ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল চাঁদ সদাগর ও সনকা হয়ে ওঠে। নাট্যকার প্রচলিত মিথের এই ঐতিহ্যকে আরো গভীরতর করার উদ্দেশ্যে আবহ নির্মাণ করেন সেভাবেই—

> ''দিকবিদিক থেকে 'নৌকা ভাসাও' এই ঐক্যতান যেন তাদের ডুবিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। অদৃশ্য সূত্রের আলোতে প্রসন্নকে চাঁদ এবং কালোর মাকে সনকার মতো পৌরাণিক মনে হয়। ওঁদের দুজনের উপরে আলোর ঢেউ কাঁপছে এবং বর্তমান কাল যেন আলোতে ঐক্যতানে অনন্ত সময়ের গুহায় বারংবার উচ্ছলিতআবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিরন্তর।''[২১]

এইভাবে নাট্যকার প্রচলিত 'মিথ' ও মনসামঙ্গলের কাহিনীকে সমকালের বিধ্বস্ত সময়ের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরে তৈরি করেন প্রত্ন ঐতিহ্যের নতুন রূপ। প্রতীকীভাবে এর মধ্যে পুনর্নির্মিত হয় প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্যের আর এক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

আধুনিক নাটকের সংরূপে মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের দেবী মনসা ও চাঁদ বণিকের মধ্যেকার যে সংঘাত সেই মিথকে আর একভাবে পুনর্নির্মাণ করেছেন নাট্যকার শম্ভু মিত্র তাঁর 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে। এই নাটকের বিশ্লেষণের পূর্বে নাট্যকার শম্ভু মিত্র সম্পর্কে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের শ্রেষ্ঠ রূপকার **শম্ভু মিত্রের** (১৯১৫-৯৭) অন্যতম মৌলিক নাটক **'চাঁদ বণিকের পালা'**। বিশ শতকের মধ্য পর্বের নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা থেকে মুক্তি কামনা ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। প্রথা ও এক ঘেয়েমির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হেতু ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে 'শ্রীরঙ্গম' নাট্যমঞ্চের সম্পর্ক ছিন্ন করে ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত হন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন এবং অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ-এর মধ্যে তিনি 'জবানবন্দী', 'অভিলাষ', 'নবান্ন', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাটক পরিচালনা করেন। বিশ শতকের বাংলা নাট্যসাহিত্যের এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি গ্রন্থাকারে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে (১৩৮৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস) প্রকাশিত হলেও 'বহুরূপী' নাট্য পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এটি প্রকাশিত হয়। বটুক ছদ্মনামে লিখিত নাটকটি 'বহুরূপী' পত্রিকায় ২৪,২৬,৩৩ ও ৪৩

সংখ্যায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় নাট্যকারের স্বনামেই তা ছাপা হয়। মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট ধারা মনসামঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি রচিত।

'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। তৃতীয় পর্বটি আবার দুটি উপপর্বে বিন্যস্ত। যথা—

১. প্রথম পর্ব

২. দ্বিতীয় পর্ব

৩. তৃতীয় পর্ব

i. তৃতীয় পর্বের প্রথমাংশ

ii. তৃতীয় পর্বের শেষাংশ

প্রথম পর্বের সূচনাতেই দেখা যায়— অতীত বাংলার গাঙ্গুড় নদীর তীরের চম্পক নগরী। এই চম্পক নগরীর যৌবনের প্রতীক সমস্ত লোকজন। অন্ধকারের মধ্যে অনেকের কণ্ঠে একটা উল্লাস-চিৎকার শোনা যায়। উচ্ছ্বল কোলাহলের মধ্যে চাঁদ সদাগরের নৌবহরের এক সাথী লাফিয়ে উঠে সমুদ্রের বুকে পাড়ি দেবার কথা ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য সঙ্গী-সাথীরাও দূর-দূরান্তের পথে পাড়ি দেওয়ার সংকল্প করে। এই সমুদ্র যাত্রার প্রধান কুলিক চাঁদ বণিক এসে সবাইকে সত্যের পথ, জ্ঞানের পথ এবং কর্মের পথের কথা বলেন। সত্যের পথে চলতে গেলে প্রচুর বাধা আসবে, সমাজ সংসারের মানুষ শুধু অপবাদ দিবে। এমনকি, নিজের ঘরের লোক, আত্মীয়-স্বজনের কাছে গালমন্দ ছাড়া কোন জয়ধ্বনি পাওয়া যাবে না। এই অস্থিরতাময় সময়ে সত্য শিবের পূজক হলে মানুষের প্রীতিভাজন হওয়া যায় না, চ্যাংমুড়ী কানী মনসারও ভজনা করতে হবে। তবে চাঁদ এই দ্বিচারিতায় বিশ্বাস করেন না। চম্পক নগরের সৃষ্টিকর্তা বাপ পিতামহদের দল নিজের সাহস, কৌশল ও বুদ্ধির জোরে সুবর্ণভূমি ছেড়ে পাড়ি দিয়েছেন দক্ষিণ সাগরে। তারা কেডার বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তাম্বপন্নির তীরে গিয়ে নোঙ্গর করেছেন। প্রাণ দিয়ে তারা নিজ নিজ প্রাণের সওদা করেছেন। তাই অন্যের কুৎসা না করে, অপরের দোষ না দিয়ে, শৃগালের মতো ধূর্তামি না করে সত্যের পথে পাড়ি দেওয়ার উপদেশ দেন। সমুদ্র যাত্রার প্রধান পুরোহিত চাঁদ সদাগর হাঁক দিয়ে বলেন—

> ''এ চম্পক নগরীর যতো নিডরিয়া সদাগর ভাই,— সেই সব আত্মার
> তর্পণ আজ আমাদের কাজ। আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য।
> আমাদের জয় কেউ ঠেকাতে পারে না।''[২২]

সকলে মিলে নায়ক চাঁদ সদাগরের সাথে পাড়ি দিতে প্রস্তুত হলে সেইসময় করালীচরণ মারফৎ

খবর পান চম্পকনগরের মহামাণ্ডলিক বল্লভাচার্য নগরে এসে পৌঁছেছেন। স্থানীয় মাণ্ডলিক বেণীনন্দন চাঁদ বণিক ও তার সঙ্গীসাথীদের সমুদ্রযাত্রাকে পণ্ড করার জন্য সংবাদ দিয়ে মহামাণ্ডলিককে নিয়ে এসেছেন। বেণীর মতে, ব্যক্তিগত কোন অভিপ্রায় থাকাই উচিত নয়। সমাজের যে আকার তাকে নিয়মশৃঙ্খলায় বেঁধে পরিপাটী করে রাখে শাসনবিধি। তাই এই শাসনবিধিকে অস্বীকার করা যায় না। নিয়মভাঙার যে উচ্ছৃঙ্খল প্রবণতা তা সমাজে কখনই প্রশ্রয় পেতে পারে না। আর যদি পায় তাহলে দেশে যেটুকু ভালো আছে সাধারণের কাছে তা শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়বে। তাতে দেশের মঙ্গলের পথে বাধা আসবে। এইরূপ নানাভাবে কৌশল করে চাঁদের নৌযাত্রায় বাধাস্বরূপ বল্লভাচার্যকে দাঁড় করায়। চাঁদ গুরু বল্লভাচার্যের মুখে সমুদ্র যাত্রার নিষেধাজ্ঞার কথা শুনে আশ্চর্য হন। নিজেকে নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন করেন এবং রাজ্যের ন্যায়, ধর্ম, শৌর্য বাঁচানোর কথা বলেন। ভট্টপাটকবাসী আচার্য বল্লভের এই ইন্দ্রপতন দেখে চাঁদ সত্যের জয়গানের কথা বলেন গুরুকে। চাঁদের বিরুদ্ধে বেণীনন্দনের মনের সংকল্প মহামাণ্ডলিক বল্লভাচার্যের হুকুমনামে ঘোষিত হয়। এতে বল্লভাচার্য ব্যথিত হন। জগতে যে এক অন্ধকার অকাল নেমেছে। যেখানে জ্ঞানের সম্মান নেই, বিদ্যার মর্যাদা নেই, সুভাষণ নেই, মাংসসুখ ছাড়া মানুষের অন্য কোন সুখের চিন্তা নেই। তাই শিষ্য চন্দ্রধরকে মহৎকার্যের কথা ভুলে গিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার কথা বলেন। কালের বিপক্ষে না গিয়ে, আদর্শের পিছনে না ছুটে বাস্তবকে মেনে নেওয়ার কথা বলেন। এটাই বুদ্ধিমানের কাজ। সহজ আশার কথা ভাবতে বারণ করেন। শিষ্য চন্দ্রধরকে উপদেশ দেন—

> ''এ জীবন অর্থহীন। অর্থহীন জীবনের এই কালীদহে শুধু যেন ঘূর্ণাচক্র ঘোরে। সেই চক্রে সূর্য বলো, চন্দ্র বলো, তারা বলো, সব যেন বুদ্ধদের মতো মুহূর্তেই লুপ্ত হয়্যা যায়। সত্য শুধু অন্ধকার। মনসার সর্পিল আন্ধার। এই অভিযান তুমি ছেড়ে দেও চন্দ্রধর, আদর্শের পিছে ছুট্যে কোন লাভ নাই।''[২৩]

কিন্তু চাঁদ ও তাঁর সঙ্গীরা নিজেরা স্বাধীনভাবে কাজ করবে বলে উল্লেখ করেন। তারা নিজেদের জীবনযাপন নিজেদের মতো করেই করতে চান। অন্যের ঘোষণা জারী নিজেদের উপর চাপিয়ে দিলে সেটা মানতে রাজি নয়। তাই তারা সমুদ্রে ঝাপ দিয়ে ভাগ্যকে ছিনিয়ে আনার সংকল্প করেন। বনমালী, শিবদাস, নরহরি, করালীচরণ ও অন্যান্য সাথীরা সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত তখন বনমালীর সঙ্গে চাঁদের সমুদ্র যাত্রায় বালিশ নেওয়া নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলে। চাঁদ সদাগরের ব্যক্তিত্বের উপর প্রশ্ন তোলে। চাঁদ সদাগরকে ভুয়ো এবং ফন্দিবাজ বলে। গোপনে চুপি চুপি নাকি মনসাপূজা করে।

এরপর নাটকের কাহিনীধারা চাঁদের ঘরের দিকে মোড় নেয়। সনকাকে দেখা যায় মনসার ঘট স্থাপন করে স্তবগান করতে। কাহিনীধারা দ্রুতগতিতে সঞ্চারিত হয় যখন চাঁদ চম্পক নগরীকে চ্যাংমুড়ি কানী মনসার ক্রোধ থেকে রক্ষা করার জন্য শিবের কাছে মিনতি করেন। এবং সনকা এই বাক্যে আঁতকে উঠেন। চাঁদ সনকার মনসা পূজার অনুমতি অগ্রাহ্য করে, নানা বাধা সত্ত্বেও মনসার ঘট ভেঙে ফেলেন। এখানে চাঁদ ও স্ত্রী সনকার মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে। ধর্মপত্নীর বিশ্বাসাঘাতকতায় চাঁদ অস্থির হয়ে পড়েন। অন্যদিকে সনকাও স্বামীপুত্র সকলের কল্যাণের জন্য মনসা-পূজা করেছেন। তার মতে রাত্রির অন্ধকারে হিংসা, পাপ, রোগ বৃদ্ধি পায়, অকারণে শত্রুবৃদ্ধি, অকারণে অর্থহানি, শুভঘটনা আকস্মাৎ বিফলে যাওয়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা পেতে পাতালবাসিনী অন্ধকার মনসার পূজা দেন। অকারণে চাঁদের সাধের গুয়াবাড়ির প্রসূতি গাছ, ফল-ফুল-মূল সব একদিনে নষ্ট হয়ে যায়, চাঁদের সবচেয়ে বড় বন্ধু শঙ্কর গারুড়ীর সর্পাঘাতে মৃত্যু, হঠাৎ করে অর্থের সামর্থ কমে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনায় সনকা ভেঙে পড়েন। তাই রক্ষা পাওয়ার আশায় মনসাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চান, অন্ধকারের পূজা করেন। অন্ধকারের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হন।

অন্যদিকে একই বিছানায় শুয়ে যে নারী অন্য কথা ভেবে গেছেন, জ্ঞানের পূজার ঘরে অজ্ঞানের পূজা করে গেছেন, তাকে চাঁদ কিছুতেই ভরসা করতে পারছেন না। এভাবেই প্রথম পর্বের ঘটনা Climax সূচকে পৌঁছায়।

এই সময় চাঁদ সদাগরের বিশ্বস্ত ভৃত্য ন্যাড়া এসে খবর দেয় চাঁদ-সনকার ছয়পুত্র সর্প বিষে প্রাণ হারিয়েছে। শঙ্কর গারুড়ী মনসার কোপে মারা গেছে তাই ওঝাদের ঘরে ঘরে গিয়ে অনুরোধ করা সত্ত্বেও কেউ আসতে রাজি হয়নি। এই সময় মহাজ্ঞান হারানোর জন্য স্বামীর দিকে প্রশ্ন তোলেন সনকা। অন্যদিকে ঘোষক এসে ঢ্যাঁটরা পিটিয়ে ঘোষণা করেন—

> ''আজ হ'তে পুনরায় অন্য দেশ না দেয়্যা পর্যন্ত গাঙ্গুড়ের সকল নৌঘাট হতে নৌকার নোঙ্গর ধুলা এই ঘোষণার দ্বারা মানা করা যায়— ... বিনা ছাড়পত্রে নৌকার নোঙ্গর খুল্যে যাত্রা করা সুকঠোর দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসাবেই গণনীয় হয়— ।''[২৪]

কিন্তু চাঁদ সমস্ত বাধা অতিক্রম করে, ছয়পুত্রের মৃতদেহ কলার ভেলায় করে গাঙ্গুড়ের জলে ভাসিয়ে দিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। বেণীনন্দন নোঙ্গর খোলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করলে চাঁদ ও তার সঙ্গীসাথীরা নোঙ্গরের কাছি কেটে দেওয়া মনস্থির করেন। চাঁদের মতে, ছয়পুত্র মারা গিয়েছে, হয়তো বা আরো পুত্র যাবে। এমনকি তাদের মধ্য থেকেই হয়তো অনেকজন যাবে।

তবুও সকলে মিলে যদি পাড়ি দিতে পারেন তারই মধ্যে আরো অনেক পুত্র বেঁচে উঠবে। সেইসব বীজ একদিন গাছ হবে, মহীরুহ হবে, ফল দিবে, ছায়া দিবে, চম্পক নগরের মুখ হাসিতে ভরাবে। কারণ এখনো এই দেশের অন্তর মরেনি, চম্পক নগর এখনো তাদের ডাকে। অবশেষে সপ্তডিঙার কাছি খুলে মাঝিমাল্লা নিয়ে সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন চাঁদ। তবে মাঝিমাল্লাদের অনেকে সমুদ্রযাত্রা নিয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে। যে চম্পক নগরীর জন্য তারা জীবনযৌবন ত্যাগ করছে সেই চম্পকনগরী তাদের কথা কি ভাবছে? জয়ের প্রতি বিশ্বাস হারাবে বারে বারে সাধারণ নাবিকেরা, আর চাঁদ সদাগর যাবেন বারে বারে বাক্যজাল বুনে, যুক্তি দিয়ে, কথকতা দিয়ে। তাদের পড়ন্ত মন উৎসাহিত করে যাবেন। চাঁদ এভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। নাবিক শিবদাসের কথায়-পাড়ি দিলে সমস্ত মনের ময়লা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। চাঁদ এইভাবে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, অজানা আলোর সন্ধানে, মানুষের সুস্থ পরিবেশের জন্য পাড়ি দিতে থাকেন। কিন্তু মনসা বাম হওয়ায় হঠাৎই সপ্তডিঙা অগাধ কালিদহের ঘূর্ণাচক্রে এসে পড়ে। সাথীরা প্রাণের ভয়ে বাঁচার পথ চাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে চাঁদের মুখে শোনা যায়— ''শুধু উদ্দেশ্যটা জানি আমি। পথ তো জানে না কেউ।''[২৫]
একথা শুনে কেউ হতাশ হয়ে হাহাকার করছে। কেউ বা চাঁদকে গালিগালাজ করছে, কেউ আবার হাঁটু গেড়ে বসে আন্ধারী মনসা মাতার স্তব করছে। এমতাবস্থায় চাঁদ বিস্রস্ত সিক্ত কেশে একলা ডিঙার মাস্তুল আঁকড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো আরাধ্য শিবকে ডাকতে থাকেন—

> ''শিব, শিব, শিবাই আমার, পথ কয়্যা দেও, পথ কয়্যা দেও, শিব
> মহেশ্বর, পথ কয়্যা দেও।''[২৬]

প্রথম পর্বের শেষে সনকাকে দেখা যায় শিশু লখিন্দরকে কোলে নিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইছেন। একা নারী, সমাজের সমস্ত পুরুষপুঙ্গদের সাথে লড়ে, ছল করে, মিথ্যা কথা বলে কোলের সন্তানকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে সে। কারণ জন্তু হোক কিংবা যাই হোক ভগবান এই ভার দিয়েছে শুধু মায়েদের উপর। এইভাবে নাটকের প্রথম পর্বের সমাপ্তি টানেন নাটককার।

নাটকের দ্বিতীয় পর্বের ঘটনা শুরু হয়েছে প্রথম পর্বের ঘটনার অনেক বছর পরে। লখীন্দর তখন উদ্দাম বালক, সে সবে যৌবনের 'অশান্ত আরম্ভের' দোরগোড়ায়। মায়ের স্নেহবন্ধন লখীন্দরের কাছে পরাধীনতার বন্ধন বলে মনে হয়। বাড়ি থেকে সে চলে যেতে চায় পিতার মতো সেও দূর দেশে পাড়ি দিতে চায়। লখীন্দরের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব কাজ করে। মায়ের বুকে মুখ রেখে সে গঙ্গাস্নানের পবিত্রতা অনুভব করে। আবার অনেক সময় মাকে শত্রু বলে মনে হয়, রাক্ষসী মনে হয়। নিজে যা ভালো বাসেন সেটাই দাঁত দিয়ে, নখ দিয়ে ছিড়ে তছনছ করতে ইচ্ছা করে। তার মতে—

'কোনটা আমার সত্যকার অনুভব? আমি কিছু বুঝি না মোটেই। আমি যেন কতোগুল্যা প্রতিক্রিয়া খালি। আমার অজ্ঞাতে যেন কীসব ঘটনা ঘটে আমার ভিতরে— ... কী এট্টা হয় যেন— অত্যন্ত অস্থির লাগে—"[২৭]

মায়ের সঙ্গে লখীন্দরের মান-অভিমানের পালা চলে। ইতিমধ্যে চাঁদ বিধ্বস্ত অবস্থায় নিঃস্ব হাতে গৃহ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেন। ভৃত্য ন্যাড়া ও সূয়া প্রথমে চাঁদকে চোর বলে প্রতিপন্ন করে। সনকাও প্রথমাবস্থায় স্বামীকে চিনতে পারেন না, পরক্ষণেই প্রদীপের আলোয় চিনতে পারেন। উপস্থিত সবাই আনন্দে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করে। কিন্তু আনন্দের এই সদাগরবাড়িতে দরিদ্রতার কারণে তিনজন ব্যতীত অন্য আর কেউ নেই।

এরই মধ্যে বেণীনন্দন ও তার অনুচরেরা চাঁদের ডিঙাহীন, নিঃস্বভাবে ফেরৎ আসাতে চোর-জোচ্চোর বলে নানা কুৎসা-অপপ্রচার রটনা করে সাধারণ লোকসমাজে। সেই সঙ্গে কেবট্ট ও তার সঙ্গীসাথীরা বনমালীকে নিয়ে চাঁদের স্ত্রী সনকার কলঙ্ক প্রচার করে বেণীনন্দনের সঙ্গে। সনকাকে গণিকা ও লখীন্দরকে গণিকা সন্তান বলে চিহ্নিত করে। এই মুহূর্তে চাঁদ ও সনকার কথোপকথনের মাঝখানে ন্যাড়া চাঁদের সম্মুখে লখীন্দরকে এনে হাজির করে। পিতাকে সম্মুখে পেয়ে হেরে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে লখীন্দর। ছোট থেকে যাকে মহাবীর বলে জানত, আজ তিনি কেন নেউটিয়্যা হয়ে, ধর্ম পরিবর্তন করে ফিরে আসে সামান্য গৃহস্থ হতে। লখীন্দরের মতে, মানুষের নিজের একটা পরিচয় থাকে। কিন্তু তারা কি শুধু মুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম ভূমিকায় অভিনয় করে যাবে। মানুষের মুখ নেই কোন? শুধুই কি মুখোশ? মানুষ কি শুধু প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি? এর বাইরে মানুষের কোন সত্ত্বা নেই? তাদের উৎস— পিতা, পিতামহ, তারাও জানে না নিজের পরিচয়। নিজের সত্ত্বাকে তারা এখনো ভালো করে চিনতে পারেনি। শুধু অভিনয় করে যায়। ইতিহাসও আত্মস্থ রূপের কোন সন্ধান পায় না। শুধু মুখোশের পরে মুখোশ বদলে গেছে। তাই তাদের কোন পরিচিতি নেই। শুধু নাটুকিয়া খেলা চলে। পিতা-মাতার প্রতি লখীন্দরের নিম্নোক্ত সংলাপটি নাটকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—

''কেন যে তোমরা সন্তানের জন্ম দেও? এই হেন কুৎসিত জগতে কেন আমাদের আনো? কোন্ প্রতিশোধ নিতে চাও— আমাদের পরে? এট্টু ভেবে কয়্যা দিও একদিন।"[২৮]

পুত্রের এই বক্তব্য শুনে সদাগর স্বপ্নোত্থিতের মতো চারিদিকে চেয়ে থাকে। কম্পিত হাত থেকে হেতালের লাঠি পড়ে যায়। অবলম্বনহীনের মতো বসে পড়ে হঠাৎ অস্ফুট সুরে 'হায় হায়' বলে

উঠে।

নাটকের ঘটনা আবার মোড় নেয়— বেণীনন্দন ও বল্লভাচার্যের পুনরায় প্রবেশ ঘটলে। সমাজ কোন মহৎ উদ্দেশ্য নয়, সমাজ শুধু ফল চায়। কিন্তু বৃদ্ধ বল্লভাচার্য শিষ্য চাঁদের ব্যর্থতায় দুঃখিত হয়। কথা সূত্রে জানা যায়— বল্লভাচার্য নয়, বর্তমানে স্থানীয় মহামাণ্ডলিক বেণীনন্দন। রাজনীতির কূটনৈতিক চালের জন্য চাঁদকে নিজের দলে আনতে চেষ্টা করে। বেণীনন্দন নিজের অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায় সম্মতি আনার জন্য যে শুধু বিশ্বাসের লগি নিয়ে এ সমুদ্র পার হওয়া কঠিন। কারণ শুধু পাড়ি দিলেই হবে না, দেশে অর্থ আনতে হবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সম্মানের জয়ধ্বনি আনতে হবে। তাহলে যতোই পাপ করো না কেন, চম্পকনগরী তা ক্ষমা করে দিবে। এ সংসারের মানুষ বিচার হয় গাছের মতন বা গাভীর মতন। যত বেশী ফল বা দুগ্ধ দিবে, সমাজে তত বেশি তার মূল্য। তাই চাঁদকে পুনরায় সমুদ্রে পাড়ি দিতে বলেন। ময়ূরপক্ষী ডিঙা তৈরি করে দিয়ে অর্থ, জন, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার জন্য যা প্রয়োজন সব দিবেন। আসল উদ্দেশ্য হল রাজভক্তর অধিকার পাওয়ার জন্য কিছু লোক বেণীনন্দনের প্রতিপক্ষ হিসাবে একত্র হয়েছে। চাঁদ যাতে কোনভাবেই এই বিপক্ষ দলের সঙ্গে যোগ না দেয়— তাই এই কৌশল। সেই সঙ্গে সম্মতি থাকলে বেণীনন্দনের গৃহের মনসাপূজার আসরে যেতে বলেন বল্লভাচার্য।

দ্বিতীয় পর্বে এরপর চাঁদ ও সনকা একান্ত আপনভাবে নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় ব্যস্ত। চাঁদ এই জটিল পৃথিবী থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে চান। শিবভক্ত চাঁদ সত্যপথে এগিয়ে জীবনে জ্ঞানের আলো প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সর্বস্ব খুইয়ে দিয়েও চ্যাংমুড়ি কানীর কাছে মাথা নত করেননি। তবুও জীবনের এই পরাজয়— চাঁদ তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। এই প্রশ্নের উত্তরে সনকা স্বামীকে দোষারোপ করেন। কর্তব্যবোধের জোরে চাঁদ শুধু নিজের কাঠিন্যই দেখিয়েছেন। নিজের গর্বের যূপকাষ্ঠে পত্নী, পুত্র, সংসার সবকিছুই বলি দিয়েছেন। একসময় সনকার মিনতিপাশ ছিড়ে চলে গেছেন আপনার পৌরুষ দেখাতে। মহাজ্ঞান হারানোর জন্য স্বামীকে অপবিত্র লম্পট পুরুষ বলে উল্লেখ করেছেন। একদিকে সদাগরের 'পাড়ি দেওনের' দায় ও অন্যদিকে সনকার নারীত্বের চাওয়া-পাওয়া— এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব যখন চূড়ান্তমাত্রায় পৌঁচেছে তখন চাঁদ বারবার সনকাকে পুরানো স্মৃতি ভুলে নতুন জীবনের দিকে পা বাড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু সনকা নারীত্বের অবমাননার যন্ত্রণা থেকে ক্রোধে ব্যঙ্গে প্রায় উন্মাদিনীর মতো চাঁদ সদাগরকে অভিমানে বলে ওঠেন—

> ''লম্পট, লম্পট তুমি। তোমার যে পরিচয় তুমি, সমাজে দেখাতে চাও,
> সেটা তুমি নয়। আদর্শ-নিষ্ঠার এই অন্তরালে যে মানুষ আছে, সেটা ওই

অহঙ্কারী কুচরিত্র চাঁদ সদাগর। ... দুস্তর সাগর পাড়ি দিয়্যা জয় নিয়্যা আসতের নাবিক প্রধান? হাঃ। হাসি পায়। মিথ্যাবাদী তুমি। কুচরিত্র, স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী-মিথ্যাবাদী—"[২৯]

এরপর নাটকের কাহিনী নতুন মোড় নেয়, যখন করালী এসে চাঁদকে জানায়, চম্পকনগরের মধ্যে সে বেণীর বিপক্ষ দল গঠন করেছে। অন্যায় ও অসৎ-এর প্রতীক বেণীনন্দনকে তাড়িয়ে চম্পকনগরে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। তাই চাঁদকে সে অনায়াসেই বলে ওঠেন— তুমি আমাদের দলে যোগ দাও নাবিক প্রধান, তারা চাঁদকে পুনর্বার পাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিবে। করালী চাঁদকে নিয়ে সম্মান প্রদানের আসর বসাবে। সেখানে চাঁদের সমুদ্রযাত্রা পণ্ড করার জন্য বেণী কিভাবে সচেষ্ট হয়েছিল, চাঁদকে পীড়ন করেছিল এবং বাধাদানের জন্য ঘোষণা জারি করেছিল— তা সবার সম্মুখে বলতে অনুরোধ করে। সেইসঙ্গে বেণীর বিপক্ষ দলের নেতা ভৈরব চাঁদকে তাদের মনসার পূজার আসরে যেতে বলেন। সাধারণ মানুষ যেহেতু মনসাকে বিশ্বাস করে। তাই বেণীর বিপক্ষে শক্তিশালী সংগঠন করতে গেলে এইসব ছোটখাটো পন্থা অবলম্বন করতে হয়। আবার অসৎ মানুষ বেণীর পতন ঘটাতে গেলে অন্যায় পথ অবলম্বন করতেই হবে। ভৈরবের সংলাপে আরো জানা যায় যে, শুদ্ধচিত্ত আদর্শবাদীরা এসে মারপিট করে না। তার জন্যে মদ্যপায়ী দুর্বৃত্তের পোষণের প্রয়োজন হয়। সেরকম আবার সাধারণ মানুষের মন বেণীর বিরুদ্ধে ক্ষেপানোর প্রয়োজন হয়, তখন তাদের সমস্ত দৃঢ়বদ্ধ সংস্কারগুলি মেনে নিতে হয়। এটাই বাস্তব অবস্থা এগুলি মেনে নিয়েই ন্যায়-নীতিকে স্থির করতে হবে। তাহলেই জয় আসবে, এছাড়া উপায় নেই।

নাটকে দেখা যায়, উভয়পক্ষের রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলি হতে হয় চাঁদ সদাগরকে। চাঁদের মধ্যে শুরু হয় দোলাচলতা। আদর্শবাদী চাঁদ বুঝতে পারেন না কোন পথ অবলম্বন করবেন। পথভ্রষ্ট হওয়া তাঁর পক্ষে সাজেও না। শেষে দিশেহারা হয়ে পড়েন চাঁদ এবং রাজনীতির খেলার পুতুল হিসেবে বিবেচিত হয়। ব্যক্তিগত জয়লাভের জন্য সে সমুদ্রে পাড়ি দেয়নি। নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য সমুদ্রে সে কোনদিন পাড়ি দেয়নি। তবে আজকে সে কী করে মনসার নাম নিয়ে পাড়ি দিবে। এরই মধ্যে লখীন্দর এসে অভিযোগ করে— পিতার জন্য তাকে ও তার মাকে সকলের কাছে কেন অপমানিত হতে হবে? দুর্বল-লখীন্দর বাস্তবের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় না, তার মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারে না। তাই এই দুর্বলতার সাক্ষী ন্যাড়াকে তার মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়। মানুষকে কৃমির চেয়ে আরো জঘন্য কীট মনে হয়েছে তার। পুত্রের কাছে নিজেকে নিরাপরাধ প্রতিপন্ন করলে এবং তার মধ্যে অপরাধবোধ ঢুকাতে নিষেধ করলে লখীন্দর পিতার

দিকে আঙুল তুলে অভিযোগ জানায়—

> ''নিজেরে যে মানুষের চায়্যা কিঞ্চিৎ বিরাট আকৃতি বল্যে মনে কর্য়েছিলে এই অপরাধ। নাটুয়ার মতো রাজা সেজ্যে ভেব্যেছিলে সত্য বুঝি রাজা হয়্যা গেছ, ... ভুলপথে চল্যে এল্যে চাঁদ সদাগর, আদ্যোপান্ত ভুল হয়্যা গেল।''[৩০]

এই প্রশ্নের উত্তর সদাগরও খুঁজে পায় না। তাই ন্যাড়াকে উদ্দেশ্য করে প্রকারান্তরে নিজেকেই তিনি প্রশ্ন করেন— সনকা, লখাই এরা কেন কষ্ট পায়? তার মধ্যে পাপবোধের জন্যই হয়তো এমতাবস্থা। তাই তার সমস্ত কাজকর্ম ভিতরে ভিতরে মিথ্যা হয়ে যায়। পায়ের গোড়ালির ভেতর দিয়ে হয়তো কোনো শনি ঢুকে বসে আছে তার অন্তরে। এইভাবে চাঁদ যখন নিজেতে নিজে দিশেহারা, তখন আবার নতুন এক অপবাদ এসে জোটে তাঁর কপালে। চাঁদের যৌবন বয়সের নৌযাত্রার সাথী বনমালী শত্রুতা করে মৃত নাবিক দঙ্গদাস, ভবদেব, শিবদাসদের বৃদ্ধ পিতাদের তাঁর সামনে এনে উপস্থিত করে। চাঁদ এদের কোথায় রেখে এসেছেন? তাদের হদিশ জানতে চান। শুধুমাত্র কৈফিয়ৎ নয়। চাঁদ তাদের মেরে ফেলে সমস্ত ধনরত্ন, নিজে লুঠ করে নিয়ে এসেছেন বলে অভিযোগ জানান। সকলকে বচনে-বাচনে ভুলিয়ে, ভবিষ্যতে স্বর্গরাজ্য হবে বলে সবাইকে মুগ্ধ করে বাণিজ্যে নিয়ে গিয়েছিল চাঁদ। ধোঁকা দিয়ে অনেকগুলি মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়, তাদের জীবন ইচ্ছা করে নষ্ট করেছে। অনুগামী হন্তারক, আত্মসুখ সর্বস্ব চাঁদ বণিক বলে অভিযোগ জানায়। এভাবে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের কাছ থেকে একের পর এক অভিযোগ, অপবাদ, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা পেতে থাকেন চাঁদ। চাঁদের মতে, কর্মের চাকায় যদি পাপপুণ্য একসূত্রে গাঁথা হয়ে থাকে, তাহলে বেণী বা ভৈরবের সঙ্গে তাঁর তফাৎ কোথায়? জীবনের সবকিছু আলুথালু হয়ে গেল বলে উল্লেখ করেন। ন্যাড়ার সঙ্গে কথোপকথনে আরো বলেন যে—

> ''পরাজিত হয়্যা মনে তো যন্ত্রণা লাগে, পত্নী নাই, পুত্র নাই, তারেপর এই অপরাধবোধ। তারা ছাড়া আর কোনো বন্ধুজন ছিল না তো কখনো আমার, ভেবে দেখ, আত্মঘাতী হয়্যা এইসব সমস্যার যন্ত্রণা মিট্যাতে পারি।''[৩১]

কোনো স্বপ্ন না দেখে, কল্পনার আদর্শ না করে, পাপপুণ্যের বিচার না করে শুধু বেঁচে থাকার কথা ন্যাড়া বললে এর প্রত্যুত্তরে চাঁদ বলেন যে, জীবনে শুধু বেঁচে থাকা বলে কোন কথা নেই। চাঁদ যখন নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে ফেলেন, কিন্তু চাঁদের মতো লড়াকু মানুষ এভাবে আত্মহননের পথে যেতে পারে না, তাই পরক্ষণেই পুত্র লখিন্দর তার পিতাকে পুনরায় পাড়ি দেওয়ার কথা

বলে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। বীর চাঁদ যে পাড়ি দেওয়া ছাড়া জীবনে শান্তি পাবে না। পিতার অনুচর হয়ে সঙ্গে যাবে লখীন্দর। তাই তাকে অনুচর করে নিয়ে যেতে বলে। পুত্রের এই আগ্রহ, অনুপ্রেরণা ও সাহচার্য শেষ পর্যন্ত মৃতপ্রায় চাঁদকে আবার নতুন করে প্রাণদান করে। তাঁর অন্তরে ঘুমিয়ে থাকা পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ নতুন প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে। পুত্র লখীন্দরকে বীর হওয়ার কথা বলেন। জীবনের যা কিছু আছে সমস্ত দিয়ে, যা সম্মতি আছে তার অর্থ দিয়ে বংশের একমাত্র ভবিষ্যৎ লখীন্দরকে পাড়ি দেওয়ার কথা বলেন। ভবিষ্যৎ একদিন রঙেতে রঙীন হয়, চম্পকনগরী যাতে সুস্থ, মুক্ত, অনর্গল হয়ে যেতে পারে, তাই চাঁদ নিজের যা কিছু আছে সমস্ত উৎসর্গ করে দেউলিয়া হওয়ার কথা বলেন। তাতে যদি চম্পকনগরীর লোক চাঁদকে ভুলে গেলে কোন দুঃখ নেই। নতুন বীরের পাড়ি দেওয়ার পথে জয়ধ্বনি দিয়ে আনন্দে উন্মত্ত হোক চম্পকনগরী। শুধু ভবিষ্যৎ সত্য হোক, এর বাইরে কিছু চায় না চাঁদ। তাই পুত্রকে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার জন্য, বীর হওয়ার জন্য আকূতি জানান। এইভাবে পুনরায় পাড়ি দেওয়ার সংকেত দিয়ে নাট্যকার দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি ঘটান।

নাটকের তৃতীয় পর্বের প্রথমাংশের শুরু হয়েছে সূত্রধরের মুখে লখীন্দরের দুস্তর সাগরে পাড়ি দেওয়ার সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে। গত্বরা, গামিনী, ধারিণী, যোগিনী— এই মতো ভিন্ন চাঁদে ভিন্ন নামে চাঁদের সর্বস্ব দিয়ে নৌকা তৈরি হয় লখীন্দর পাড়ি দিবে বলে। কাঠুরিয়ার দল অরণ্যের গর্ভে ঘুরে ঘুরে পাকা পাকা গাছে 'ঢ্যারা চিহ্ন' দেয় ভালো কাঠের জন্য। ভলুয়া সর্দার ডিঙা বানানোর যাবতীয় সবকিছু দেখাশোনা করেছেন। শিবাই তার পূজা প্রত্যাখান করেছে ভেবে চাঁদ নেশাগ্রস্ত হয়ে এই কর্মব্যস্ত জীবনের শব্দ শুনে মনে মনে ভাবেন এই তপোবনে তাঁর প্রবেশের অধিকার নেই। শুধুমাত্র মুদ্রাভরা থলি নিয়ে অকাতরে অর্থের যোগান দেন।

অন্যদিকে ভলুয়া সর্দারের মুখে শোনা যায়, দেশে এমন নেতা নেই যাকে সশ্রদ্ধায় চাওয়া যাবে, যাকে বীর বলে মনে হবে। অত্যাচারী বেণীকে সরিয়ে নেতা হয়েছে আরেক অত্যাচারী দল করালী ভৈরবরা। বেণীনন্দন পাজী হলেও, ঘুষঘাষ নিলেও কিন্তু কাজে শক্ত ছিল। দেশের উন্নতি তার সময় অনেক তাড়াতাড়ি হয়েছে। তার কালে ধনী আরো ধনী হয়, দরিদ্র ভিক্ষুক হয়, চট্টভট্টরা আরো লালে লাল হয়। আজও ভলুয়া সর্দারের মতো লোকেদেরও লাভ হতো। কিন্তু এখনকার করালী ভৈরবদের মতো সুরা ও বিলাস-ব্যসনে প্রচুর অর্থ খরচ কোনদিন করেনি। দেশে তাই অরাজকতা চলছে। এই নেতা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে লটবর নেতা নামে এক নারীকে নিয়ে আসে কাজের মধ্যেখানে। এ নেতাকে দিয়ে লটবর প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। ভলুয়া, লটবর ও

নেতার কথোপকথনে অনেকটা যেন Dramatic Relief ঘটে। এখানে পুনরায় সূত্রধর প্রবেশ করে ঘোষণা করে বেহুলা-লখীন্দরের সংবাদ। মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর মতো বেহুলা-লখীন্দরের মৃত্যু আশঙ্কায় চাঁদ লোহার বাসরঘর নির্মাণ করেন। সবাই এ নিয়ে সন্ত্রস্ত, কালসর্প যাতে কোনভাবে লখীন্দরকে দংশন করতে না পারে তাই সবাই সচেতন থাকে। ঘটনাধারা এরপর সরাসরি বেহুলা-লখীন্দরের বাসর ঘরের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করে। সনকা পুত্রবধূ বেহুলাকে প্রতিজ্ঞা করায় যে আমৃত্যু সর্বদা লখীন্দরের কাছাকাছি থাকবে। যদি কোনো সর্বনাশ আসে তাহলে নিজের জীবন দিয়ে তাকে রক্ষা করবে। সনকা লখীন্দরকে পাটনে না যাওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করাতে বললে; চাঁদ বণিকের বংশধরকে কীভাবে পাড়ি দিতে বাধা দিবে? এবং তা অন্যায় হবে বলে বেহুলা মন্তব্য করে। বেহুলা ইষ্ঠদেবতার নামে প্রতিজ্ঞা করে স্বামীর কাছেই থাকবে বলে। সনকা বাসর ঘরের পিছনে মনসার ঘট রাখেন যাতে কালসর্প লখীন্দরকে দংশন না করে। চাঁদ উগ্র মদ্যপ অবস্থায় শিবের নামজপে ব্যস্ত। সনকা তাঁর এই অবস্থা দেখে পুরনো সেই আদর্শস্থানীয় শ্রদ্ধান্বিত চাঁদ সদাগরের কথা বলেন। চাঁদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, আজকের এই চাঁদ সেই চাঁদ নয়। এই চম্পকনগরী যৌবনের চম্পকনগরী নয়, যার জন্য তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন। আজকের এই নগরীতে মনসা সর্বত্র। এই মনসার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করবে কে?

এরপর নাটকে পাই লখীন্দর বেহুলার কথোপকথনের দৃশ্য। চম্পকনগরে বুদ্ধিহীন, বোধহীন এবং মিথ্যাবাদী মানুষদের দেখে চম্পকনগরীর উপর ঘৃণা হয় লখীন্দরের। সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধু কর্তব্য করার কথা বলে। পরক্ষণেই আবার চলে চাঁদ সনকার কথোপকথন, সেই সঙ্গে পুনরায় দেখানো হয় বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী। লখীন্দর চায়— বেহুলা যেন আজ রাতে নিজেকে উন্মুক্ত রেখে তাকে গ্রহণ করে, অকাতরে ভালোবাসে। বেহুলাও অন্তরের আবেগে সবকিছু ভুলে যখনই স্বামীর অনেক নিকট হতে চায় তখনই সনকার নির্দেশ যেন তাকে আবেগের রাজ্য থেকে বাস্তবের কঠিন মাটিতে দাঁড় করায়। ভগ্নকণ্ঠে তাই বেহুলা উচ্চারণ করে যে মোহের জাল বিস্তার করে সে লখীন্দরকে পথভ্রষ্ট করতে চায় না। কিন্তু লখীন্দর চায়— জীবনের আদিম শিকড়ে মুখ দিয়ে জীবনকে সার্থক করতে। এভাবে তারা যখন একান্ত আলাপচারিতায় ব্যস্ত তখন একদল যুবক ঝাঁপিতে করে নাগিনী নিয়ে রেখেছে বাসর ঘরের দিকে। গুপ্তপথে ভয়িলকে এগিয়ে দেওয়া হয় কাজ হাসিল করার জন্য। এদিকে বেহুলা লখীন্দরের মধ্যে এই সময় চলে ভুল বোঝাবুঝির পর্ব। অন্যদিকে চাঁদ ও সনকাকে দেখা যায় নিজেদের আত্মসমালোচনায় ব্যস্ত। সনকার সংলাপের মধ্য দিয়ে নারীসত্তার হাহাকার ফুটে ওঠে—

> ''আমি কী? কী চাই অন্তরে আমি? (কান্নার দমক শেষে) পুরুষের নির্মিত সমাজে নারী তার আপন চরিত্র হতে ভ্রষ্ট হয়্যা গেছে। তাই নারী নিজেও জানে না কিসে সে পূর্ণতা পাবে।''[৩২]

হঠাৎ এই সময় বেহুলার আর্তনাদে জানা যায় লখীন্দরকে কালসর্প দংশন করেছে। বেহুলা আতঙ্কে হায় হায় করলে সনকা ও চাঁদ ছুটে আসেন। ছুটে আসে বুড়ো ওঝা, ন্যাড়া। আরো আসে প্রদীপ হাতে পড়শী মেয়েরা। সনকা তীব্র আক্রোশে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন এবং উন্মাদিনীর মতো গালি দেন বেহুলাকে। পুত্রবধূকেই সনকা কালনাগিনী বলেছেন। যুবতীর ছদ্মবেশে নাগিনী তার গৃহে বৌ সেজে লখীন্দরকে কেড়ে নিতে এসেছে, রক্ত খাকি মনসা বলে ধিক্কার দেয়। এই সময় বুড়ো ওঝা এসে সনকার রাখা মনসার ঘট এনে দেখান। পুত্রশোকে সনকা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। চাঁদ সদাগরও স্থির হয়ে যান। স্বামীহারা বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফেরাতে অশ্রু প্লাবিত মনে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে 'কলার মান্দাসে' করে গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যায়। ভেসে যায় লখীন্দর ও বেহুলা, সম্মুখে চাঁদ নিশ্চল হয়ে বসে থাকেন। এরই সঙ্গে তৃতীয় পর্বের প্রথমাংশের সমাপ্তি ঘটে।

নাটকের শেষ অংশ অর্থাৎ তৃতীয় পর্বের শেষাংশের সূচনা হয়েছে সূত্রধার ও জুড়ির ছড়া ও গানের মধ্য দিয়ে। চাঁদ বণিকের সব আশা নির্মূল হয়েছে, একমাত্র বংশধর লখীন্দরেরও মৃত্যু ঘটেছে। বৃদ্ধ চাঁদ এখন প্রায় উন্মাদ। প্রতি রাত্রে এ পল্লীতে ও পল্লিতে গিয়ে জন্তুর মতো আর্তনাদ করে বেড়ান। সাধারণ মানুষজন ক্ষিপ্ত হয়ে তাড়া করে ফিরে— চাঁদ পালিয়ে গিয়ে ঘরে লুকান। দিন-যাপনের কোন ঠিক নেই, বন্ধকী বাড়িতে বাস করেন। স্নানাহারাদির কোন ঠিক নেই। অন্ধকার কুঠুরীতে ইঁদুরের মতো বেঁচে থাকেন। চ্যালাকাঠ ছুড়ে মানুষে তাকে আহত করে। চাঁদ একসময় নিজের মতো বলে ওঠে—

> ''যেট্যা ঠিক মনে হয়্যেছিল, সেট্যারেই ভুল মনে হয়। তবু তো মানুষ চায় একপথে শেষাবধি যাবে।— বড় আলুথালু হয়্যা গেছে ন্যাড়া, সব বড় আলুথালু হয়্যা গেছে।''[৩৩]

দেশে আবার নেতার বদল ঘটেছে। করালী-ভৈরবদের সরিয়ে বেণীনন্দন পুনরায় দেশের ক্ষমতার সিংহাসনে বসেছেন। চাঁদ সদাগর বলে যে একটা লোক ছিল, মানুষ এখন তা ভুলে গেছে। শুধুমাত্র দূরদেশ থেকে এক যুবক এসে চাঁদ বণিক সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে চায় কাব্য রচনা করবে বলে। চাঁদ সদাগর ন্যাড়ার দেওয়া মুড়ি খেতে গিয়ে চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন। সেই সময় অন্ধকারে মানুষের মতো কিছু জীব চাঁদের সাথে কথা বলে। ভলুয়া সর্দারের মুখে শোনা যায়— বেহুলা নাকি সতীত্ব

বিসর্জন দিয়েছে। বেণীনন্দনও এসে চাঁদকে নীতি শিক্ষা দেন, তাঁর আদর্শের প্রতি ব্যঙ্গ করেন। পুরুষের কণ্ঠে শোনা যায় নীতি বলে কিছু নেই, শুধু মনসার নিয়ম রয়েছে। সে নিয়ম আবার নিয়তির মতো। তারই ফাঁসে বান্ধা রয়েছে সমস্ত পৃথিবী। নারীর কণ্ঠে চাঁদকে প্রশ্ন করে কেন চাঁদ পাড়ি দিতে গিয়েছিল?

হঠাৎ করে ইতিহাসের বদল ঘটে আবার যখন শোনা যায় ক্ষমতার লোভে বেণীনন্দনের পুত্র সুবল নিজের পিতাকেই হত্যা করে। ন্যাড়ার মতে শিব কোথাও নেই, সর্বত্র মনসা বিরাজমান। তাই কী করা উচিত চাঁদকে প্রশ্ন করে। এর মধ্যে পিছন থেকে ময়লা পাটের চাদর জড়িয়ে বেহুলার প্রবেশ ঘটে। চাঁদ মনসার পূজা দিবে এই শর্ত করে বেহুলা লখীন্দরকে ফিরিয়ে আনে। সেই সঙ্গে বেহুলার মধ্যে অপরাধ বোধও কাজ করে। চাঁদ বণিকের মতো বিরাট মানুষের চির জীবনের অটল প্রতিজ্ঞা ভেঙেছে সে। তাই মাথা নিচু করে বলে—

> ''বেহুলার আধখানা মন কয়, আমার যা হয় হোক পূজা তুমি দিও না শ্বশুর।
> যতো কষ্ট কর্যা থাকি আমি— সমস্ত বিফলে যাক, তবু— ''[৩৪]

পরক্ষণেই আবার পূজা দিবে কি দিবে না চাঁদ সদাগর— তা জিজ্ঞেস করেন। শ্বশুরকে আরো বলেন যে—সে আর আগের বেহুলা নেই। অনেক কায়দা করে স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। পুত্রবধূর শর্ত মতো চাঁদ পূজা দিতে চায় মনসার। চাঁদের মতে, জীবনের থেকে অঙ্ক কষে কষে শিবাইয়ে পৌঁছতে চেয়ে শিবাইকে পান না তাই এবার শিবাই থেকে অঙ্ক কষে কষে জীবনে পৌঁছতে চান, দেখে শিবাই মেলে কি না। বেল পাতা দিয়ে মনসার পূজা দিবেন বলে স্থির করেন চাঁদ। শিবের খেলা শেষাবধি খেলে যেতে চান তিনি।

নাটকের একেবারে শেষে দেখা যায় বেহুলা লখীন্দরকে জানায় যে পিতা গেছে মনসার পূজা দিতে, কারণ চাঁদ যদি পূজা না দেয় তাহলে নাওয়ের উপরে পুনরায় লখীন্দরের মৃত্যু ঘটবে। তেত্রিশ কোটি লোভী চোখের সামনে ঊরুদেশ দেখিয়ে, কাঁচুলি শিথিল করে, লাস্যনৃত্য করে এই বেহুলা স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছে। তাই তার মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করে। নতুন করে ঘর বাঁধতে গেলে স্বামীর আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে। আবার কলঙ্কিত মুখ নিয়ে নিছনি নগরীতে সে দাঁড়াতে পারবে না। তাই সে বিষ পান করে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। অন্যদিকে লখিন্দরের জন্য চাঁদ মনসার পূজা দিতে বাধ্য হয়। তার পরে সে কিভাবে বেঁচে থাকবে? মনসার দুয়ারে গিয়ে ভিক্ষা করে লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনে বেহুলা। সেই বেহুলা যদি বিষপানে মারা যায়, তাহলে সজ্ঞানে কীভাবে সে বেঁচে থাকবে? অবিরাম এই কষ্ট বয়ে নিয়ে কীভাবে বেঁচে থাকবে, তাই

বেহুলাকে একসঙ্গে 'ভালোবেস্যে বেস্যে' মরার প্রস্তাব দেয় লখীন্দর। এইভাবে বেহুলা-লখিন্দর ভালোবাসার তৃপ্ত আস্বাদ নিতে নিতে বিষ পান করে। জীবন-যন্ত্রণা থেকে উভয়েই রেহাই পায় চিরদিনের মতো।

চাঁদ মনসাকে পূজা দেন এরই মধ্যে। বাম হাতে পূজা দিয়ে হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে মনসাকে প্রণাম করে জীবন ভিক্ষা চান বেহুলা-লখীন্দরের। যাতে তারা ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই দেখে বেহুলা-লখীন্দরের মৃতদেহ। চাঁদ সদাগর দুঃখ-যন্ত্রণার সঙ্গে বলে ওঠে—

> ''এট্যাও বিফলে গেল! পূজা দেওয়া হোল। তবু যেন পূজা দেওয়া হয় নাই। পাড়ি দিয়্যেছিনু, তবু যেন পাড়ি দেওয়া হয় নাই। ঘর বেন্ধেছিনু তবু যেন ঘর বান্ধা হয় নাই। — তুমি তো উলঙ্গ শিব তাই মোরে বুঝি উলঙ্গ করাতে চাও?''[৩৫]

চাঁদ বণিকের সমস্ত পরিচয় যেন জলের আল্‌পনা। শিব যেন সব মুছে দিতে চাই। তবুও চাঁদ পাড়ি দিয়েছিল। শিবদাস, ভবদেব, দঙ্গদাস-একদিন চাঁদের পাড়ি দেওয়ায় বিশ্বাস করেছিল। চাঁদ তাই সাগরের তল থেকে তাদের আবার উঠে আসার আহ্বান জানায়। কারণ এদের ছাড়া চাঁদের কোন পরিচয় নেই, আবার চাঁদ ছাড়া এদের কোন পরিচয় নেই। তাই চাঁদ এদের নৌকার দাঁড় তুলে নিতে বলেন, পুনরায় পাড়ি দেওয়ার জন্য। নাটকের শেষে দেখা যায় সেই পুরোনো নাবিকরা যেন ছায়ার মতো আসে। তাদের সারা দেহে শ্যাওলা, সমুদ্রের তলদেশের ঝাঁঝি জড়ানো। পরনের যন্ত্রগুলো যেন পচে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে। তাদের মৃত চোখগুলো বিস্ফারিত। তারা যেন ঢেউয়ের দোলায় দুলতে-দুলতে আসে। চাঁদ তাদেরকে স্বাদরে আহ্বান জানান এবং শিবের সন্ধানে পাড়ি দেওয়ার জন্য পুনরায় ঘোষণা করেন। 'পাড়ি দেও— পাড়ি দেও' নাটকটি এখানেই সমাপ্ত হয়।

নাট্যকার 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের বিষয়কে গ্রহণ করলেও তিনি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেননি। প্রচলিত মনসাপুরাণ ও মিথকে বিভাজিত করে, কেন্দ্রকে বিশ্লেষণ করে বিনির্মাণের পথে অগ্রসর হয়েছেন। কাহিনির ভেতরের কাহিনিকে ভেঙে ভেঙে দেখেছেন। বিনির্মিত পরিসর থেকে আপন স্বাতন্ত্র্যের জগৎটি চিহ্নিত করে সমকাল চেতনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আধুনিক মনন ও ব্যক্তিচেতনার সংকটকে মিশ্রিত করে তৈরি করেছেন এক নতুন শিল্প। প্রচলিত এই কাহিনিকে কেন্দ্র করে নাট্যকার 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি রচনা করলেও সেখানে একদিকে যেমন তৎকালীন যুগ-পরিবেশকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। অন্যদিকে তেমনি প্রচলিত কাহিনি চাঁদ থেকে একটু সরে এসে মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের কাহিনিকে নবায়ণ ঘটিয়ে সমকালীন যুগ-পরিবেশকে সূচারুভাবে এ পালায় স্থান দিয়েছেন। নাট্যকার মধ্যযুগের

মনসামঙ্গলের ব্যতিক্রমী চরিত্র চাঁদ সদাগরকে আশ্রয় করেই যেমন নাটকটির নামকরণ করেন, তেমনি তাকে আশ্রয় করেই তাঁর অটল সাহস, গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, তাঁর আপসহীন সংগ্রামী মনোভাবকে বিশ শতকের যুগ-যন্ত্রণার দোলায় চাপিয়ে পৌঁছে দিলেন আগামী দিনের দরবারে। নাটকের প্রথমেই দেখা যায় চাঁদের নেতৃত্বে সমুদ্রের বুকে পাড়ি দেওয়ার প্রস্তুতি ও সংকল্পের চিত্র। দিনরাত মানুষের বুকে ভরসা রাখলেই জয় হবেই হবে বলে চাঁদ ঘোষণা করেন। সৎ চিন্তা, সৎ কর্ম ও সৎ পথ সম্বলিত জয়ের আকাঙ্ক্ষাই চাঁদকে বিপরীত অন্ধকারময় শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত করে। প্রথমে মহামান্ডলিক বল্লভাচার্য ও কুচক্রি বেণীনন্দনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব শুরু হলেও পরে বৃহৎ অন্ধকারের শক্তি মনসার সঙ্গে শুরু হয় তাঁর প্রকৃত লড়াই। চাঁদের সঙ্গে মনসার এ লড়াই সৎ-এর সঙ্গে অসৎ-এর। এ লড়াই সত্যের সঙ্গে অসত্যের, এ লড়াই আলোর সঙ্গে অন্ধকারের, এ লড়াই জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের। অন্ধকারের মধ্যে মানুষ যে নিজের মতো করে ন্যায়-অন্যায় বিচার করে নিয়ে বাঁচবে। চাঁদ চরিত্র পরিকল্পনায় এই বিচার করে বেঁচে থাকার আর্তিই প্রকাশিত হয়েছে। অন্ধকার নয়, অন্ধকারের আগল ঠেলে আলোয় পৌঁছানোও যে মানুষের এক বিশেষ দায় তাও চাঁদ সদাগর আমাদেরকে বুঝিয়ে দেন। চাঁদ বণিকের এই সত্য ও আলোকে আঁকড়ে ধরার লড়াই যে প্রকান্তরে নাট্যকার শম্ভু মিত্রের ব্যক্তি জীবনদর্শনেরই প্রকাশ তা সমকালীন সময় সঞ্জাত জীবন যন্ত্রণা ও ব্যক্তি জীবনাদর্শনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা নাটক 'চাঁদ বণিকের পালা'য় যথার্থ শিল্পরূপ লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক অনিরুদ্ধ আলি আক্‌তার যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করা প্রয়োজন—

> ''বিশ শতকের মধ্যভাগের দেশজ অন্ধকারময় আবহকে নাটককার শম্ভু মিত্র মনসা-মঙ্গলের পুরানো গল্পের ফ্রেমে নতুন মাত্রা সংযোজন করে প্রকাশ করেছেন। চাঁদের জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া, সংসারে বিফল মানুষ হিসেবে প্রতিপন্য হওয়া, পুত্র-পুত্রবধূর আত্মহনন— সবই চাঁদকে এক নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু নাটকের শেষে চাঁদের নতুন করে পাড়ি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাই নাটকটিকে জীবনমুখী করে তুলেছে। নাটকটি অন্ধকারের নাটক হয়েও শেষ পর্যন্ত সত্য-শিব-আলোর নাটক হয়ে উঠেছে।''[৩৬]

উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত মনসামঙ্গলের মূল কাহিনিকে নাটকের বহিরঙ্গে মোটামুটিভাবে বজায় রেখে শ্রী শম্ভু মিত্র মিথ কাহিনির নবজন্ম ঘটান। মনসার সঙ্গে চাঁদের সংঘাত, মনসার পূজা প্রচারের আপ্রাণ প্রচেষ্টা, চাঁদের একগুয়ে মনোভাব এবং পরিণামে চাঁদের পরাজয়—

মনসামঙ্গলের মূল এই অঙ্গটুকু বজায় রেখে তারই মধ্যে সত্তরের দশকের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়াকে নিজ দৃষ্টিভঙ্গিতে মন্থন করে মিথ-কাহিনীর মধ্যে সুচারুভাবে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। সমকালীন রাজনৈতিক ডামাডোল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা, যুগযন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। মিথ কাহিনির একটু আধটু পরিবর্তন ঘটেছে; সমকালীন চিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে। নাটকের ঘটনায় নতুন বাঁক সৃষ্টি, চরিত্রে অন্য ধরনের মাত্রারোপ, সমকালের আবহাওয়াকে পরিস্ফুট করতে অসংখ্য চরিত্রের আগমন ঘটানো-এ সব মিলিয়ে পুরোনো আখ্যানটি নতুন করে ফুলে ফেপে উঠেছে। নাটককারের এই প্রচেষ্টা বিপুল মাত্রায় সার্থকমণ্ডিতও হয়েছে। উক্ত নাটকটিতে মনসাপুরাণের কাহিনি তথা মনসাকথার কীভাবে নবরূপায়ণ ঘটেছে, আধুনিক রূপান্তর কীভাবে ঘটেছে এবং নতুনতর ব্যঞ্জনা কীভাবে নাটকের দেখা দিয়েছে নিম্নলিখিত কয়েকটি সূত্রের সাহায্যে তা দেখানোর চেষ্টা করছি—

১. মনসামঙ্গল কাব্যের ভাবনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায় দুটি বিরোধী শক্তির চারিত্রিক পরিচয়ে। নাটকে মনসাদেবীর পরিচয় রয়েছে, কিন্তু একবারের জন্যও সরাসরি সংঘাত নাটকে দেখা যায়নি। মনসাদেবীর প্রতিনিধি রূপে বেণীনন্দন ও বল্লভাচার্যের উপস্থিতি দেখা যায়। কাব্যে দেবতা বনাম মানুষের লড়াই, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ বনাম মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-এর লড়াই। কিন্তু এ নাটকে সেই সংঘাত দাঁড়িয়েছে চাঁদ বনাম মনসার অনুগামীদের, মানুষ বনাম মানুষের। শেষ পর্যায়ে এই সংঘাত উত্তীর্ণ হয়েছে তাত্ত্বিক সংঘাতে— আলো বনাম অন্ধকারের, সত্য বনাম মিথ্যার। চাঁদ সদাগরের সমুদ্রের পাড়িতে বাধাদান করেন মান্ডলিক বেণীনন্দন। তাই নাটকে বেণী মহামাণ্ডলিক বল্লভাচার্যের দ্বারা নৌ-যাত্রার নিষিদ্ধ জারি করে। নাটকের প্রথমেই দেখা যায় দেবী মনসার কোপে চাঁদকে হারাতে হয় ছয়পুত্র। এভাবে চাঁদের বিরুদ্ধে চলে মানব ও দৈবী আক্রমণ। চাঁদ এসবকিছুকে অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়েন মহাসমুদ্রে আলোর সন্ধানে, বেরিয়ে পড়েন জয়ের নেশায়। মনসার কোপে চাঁদের এ সত্যসন্ধিৎসা, আলোকাঙ্ক্ষা কালীদহের ঘূর্ণাবর্তে তলিয়ে যায়। সপ্তডিঙা, সহযাত্রীদের হারিয়ে চাঁদ এক পরাজিত, হারুয়া মানুষ রূপে, বিফল মানুষ রূপে চিহ্নিত হন। সেই সঙ্গে নিঃস্ব চাঁদের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের রটনা, স্ত্রী-পুত্রের অভিযোগ তাকে আরো হতাশায় জরাজীর্ণ করে তোলে। তবুও চাঁদ শিব এবং সত্যকে ছাড়তে নারাজ। পরে পুত্র লখীন্দরকে আকড়ে ধরে এর প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিন্তু প্রতিপক্ষের চক্রান্তে লৌহবাসরে লখীন্দরের মৃত্যু ঘটে। এইভাবে সম্পূর্ণ নাটক জুড়ে চাঁদ বনাম প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্ব, মানুষ বনাম মানুষের দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। যা নাটকটিকে নতূনমাত্রায় উত্তীর্ণ করেছে।

২. বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনিকে নাটককার নতুন করে দেখিয়েছেন। লখীন্দরের মধ্যে দিয়ে আমরা তৎকালীন যুব সমাজের অস্তিত্বের সংকট দেখতে পাই। প্রথম থেকেই সে একা থাকতে ভালোবাসে। নিজের পরিচয়, পিতার পরিচয়, বংশের পরিচয় খুঁজে বেড়ায়। বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায় না, বেঁচে থেকেও যেন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। নৌবহর থেকে ফিরে আসা পিতার দুর্দশা দেখে লখীন্দর ব্যথিত হয়, কিন্তু সংসারের প্রতি দায়িত্ব জ্ঞানহীন পিতাকে ভৎর্সনা করতেও পিছুপা হয় না। পিতাকে দায়ী করেন মা সনকা ও নিজের দুরাবস্থার জন্য। অন্যদিকে চাঁদ যখন নিজের স্ত্রী-পুত্র এবং পারিপার্শ্বিক কিছু কূটনৈতিক ব্যক্তির অভিযোগের দায় ঘাড়ে নিয়ে জর্জরিত, ক্লান্ত। তখন এই জীবনের সমুদ্রে ব্যর্থ পিতার মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য পিতার সঙ্গে অনুচর হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করে। লখীন্দরের এই মানসিকতা আমরা মনসামঙ্গলের লখীন্দরের মধ্যে পায় না। সদ্যবিবাহিত লখীন্দরও আমাদের কাছে নতুনভাবে উঠে এসেছে। স্ত্রী বেহুলার কাছে তার ক্লান্তি, বিষণ্ণতা, আত্মদাহ তুলে ধরা, গভীরতর মিলনাকাঙ্ক্ষা, নববধূ বেহুলার কাছে আত্মসমর্পণ-সমস্তই নাটকে নতুনভাবে উঠে এসেছে। তার অন্তরের অস্থিরতা, চঞ্চলতা এবং অপ্রকৃতস্থতাকে বেহুলার শান্ত, স্থির, শীতল আবহাওয়া দিয়ে বিনাশ করার আহ্বান জানায়। বেহুলার মধ্যে সে আশ্চর্য সুন্দর সবুজ দ্বীপভূমির সন্ধান করে, নাটকে এইভাবে লখীন্দরের চরিত্রের নবরূপায়ণ ঘটেছে। বেহুলা চরিত্রেরও পরিবর্তন দেখতে পায় নাটকে। শুধুমাত্র পতিব্রতা নারী হিসাবে নয়, তাঁর মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন জাগে, তাই লাস্য করে উরুদেশ দেখিয়ে দেবতাদের তুষ্ঠ করে স্বামীকে ফিরিয়ে আনলেও তার সম্মানে বাঁধে। স্বামীর জীবনে যাতে কোন আঁচ না লাগে তাই সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। শ্বশুর চাঁদ সদাগরকে পূজা দিতে বাধ্য করালেও তার মধ্যে আত্মদ্বন্দ্ব দেখা যায়.। আদর্শস্থানীয়, পৌরুষদীপ্ত চাঁদের আদর্শের বিচ্যুতি যে তারই জন্য হয়েছে, তাই তার মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করে। আবার নিজের খেয়ালে বলে ওঠে তার যায় হয় হোক, পূজা যাতে না দেয় শ্বশুর। বেহুলার এই পরিচয় আমরা মনসামঙ্গল কাব্যে পায় না। আধুনিক যুগের নারীর মানসিকতা ফুটে উঠেছে নাটকে। নাটকে আবার বেহুলা-লখীন্দরের আত্মহত্যার ঘটনা যেমন অভাবনীয়, তেমনি বৈপ্লবিক। কাব্যের কাহিনীতে দেখা যায়, সর্পাঘাতে মৃত স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য সে দেবতাদের নৃত্যে সন্তুষ্ট করে। স্বামীকে জীবিত করে গৃহে ফিরে আসে এবং চাঁদ মনসার পূজা দিলে স্বামীসহ স্বর্গালোকে গমন করে। কিন্তু এ পালায় ঘটেছে সম্পূর্ণ বিপরীত। বেহুলা জীবনের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মৃত স্বামীকে দেবতাদের কৃপায় ফিরিয়ে এনেছে ঠিকই কিন্তু তারপর একদিকে লখীন্দরের প্রাণের বিনিময়ে তারই পিতার মনসাপূজা প্রদান ও অন্যদিকে লাস্যনৃত্যে

বেহুলার কলঙ্কিত হওয়া, নটী বেহুলাতে পরিণত হওয়ায় বেহুলা আত্মহননের পথ খুঁজে নেয়। সেই সঙ্গে মর্ত্যলোকে ফিরে আসা লখীন্দর অস্তিত্বের গ্লানিকে চিরতরে মুছে দিতে বিষপান করে আত্মহত্যা করে। এই যুগল আত্মহনন, বিশেষ করে লখীন্দরের দুবার মৃত্যু একান্তভাবেই প্রতীকী সত্তরের দশকের অস্থির দেশের যুবশক্তির শারীরিক ও আত্মিক মৃত্যুরই ইঙ্গিতবাহী। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সনৎকুমার নস্কর তাঁর 'প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা' গ্রন্থটির 'অনুসৃজনে মনসাপুরাণ' প্রবন্ধে যা উল্লেখ করেছেন তা এখানে তুলে ধরা দরকার—

> ''ঠিক এই জায়গাটিতেই নাটককার আর মিথের পরিচিত চৌহদ্দির মধ্যে থাকেন না, তার সমকালের জীবন-জিজ্ঞাসার রূঢ় আঘাত দিয়ে সেই দেওয়াল ভেঙে ফেলে নতুন একটা প্রত্যয়ের মুখোমুখি দর্শককে দাঁড় করিয়ে দেন। বস্তুত এ নাটক যে আধুনিক সময়ের যন্ত্রণা, জিজ্ঞাসা, উৎকান্তি ও পথ সন্ধানেরই শিল্পরূপ সে নিয়ে আর কোনও সংশয় থাকে না বেহুলা, লখিন্দর ও চাঁদের অ-কাব্যিক পরিণতি দর্শনে।''[৩৭]

বেহুলা-লখীন্দরের বিষপানে আত্মহত্যার ঘটনা সমকালের সংকটকে স্পষ্ট করে। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ এক ব্যতিক্রমী ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে। এছাড়া নীতিহীন, আদর্শহীন পৃথিবীতে বাঁচার কোনো মূল্য নেই। তাই আত্মহত্যার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এখানে নতুন ভাবনার জন্ম দেয়। পাশাপাশি সমকালের যুবশক্তির হনন ও আত্মহননের মধ্য দিয়ে উদভ্রান্ত সময়ের অপমৃত্যুও যেন রূপকের আড়ালে প্রতিভাসিত হয়। সেই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিরুদ্ধে এক চরম প্রতিবাদ। লেখকের চিন্তার এই স্বাধীনতা তৈরি হয় বিনির্মাণের পথ ধরে। পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে তিনি মূল কাহিনির পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন এক কাহিনি নির্মাণ করেন।

৩. নাটকে সনকাকে দেখা যায় মনসাদেবীর পূজক হিসেবে। স্বামী-পুত্রের কল্যাণই মনসা ভজনার প্রধান শর্ত। মূল কাহিনির সঙ্গে এগুলির মিল থাকলেও নাটকে সনকার সঙ্গে চাঁদের দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র মনসাপূজাকেন্দ্রিক নয়, নিজেকে একজন স্বামী বঞ্চিতা নারী হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়েছেন। চাঁদ নিজের আদর্শে অটল থাকতে গিয়ে স্ত্রী-পুত্রের দায়িত্ব পালন করেননি। যৌবন বয়সে সনকার প্রেমকে উপেক্ষা করে পাড়ি দিয়েছিলেন। বার্ধক্যের সেই প্রেম দমিত হয়ে পড়লে তা কি এখন পাওয়া যায়। এখন চাঁদ তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কাতর হলেও সনকার পক্ষে তা সম্ভব নয়। এই সনকা দ্বান্দ্বিকতায় জটিল। চাঁদ গৃহিনী সনকার অস্তিত্ব স্পষ্টত জননী ও জায়াসত্তায় বিভক্ত এবং তিনি কতটা যে প্রিয়া আর কতটা যে মাতা এই গভীর প্রশ্নের দ্বন্দ্বে

জর্জরিত। এমনকি নৌ-অভিযান থেকে ফেরৎ স্বামীকে লম্পট, অপবিত্র, অহংকারী, কুচরিত্র বলে প্রতিপন্ন করেন। স্বামীর পরাভবে ব্যথিত হলেও তাঁর ভুল সিদ্ধান্তগুলি আঙুল তুলে দেখিয়ে দেন। নাটকের শেষে আবার দেখা যায় প্রেয়সী থেকে রূপে চাঁদের সঙ্গে মদ্যপানে ব্যস্ত। উন্মাদিনীর মতো নিজেকে উজাড় করে দেন বিলাসিতায় মগ্ন। নাটকের সনকা গোপনে প্রতিজ্ঞাবাক্য করিয়ে নেয় বেহুলাকে, যাতে লখীন্দর সবসময় স্ত্রীর কাছেই থাকে। পাড়ি দিতে না যায়। এই প্রসঙ্গটিও কাব্যের মধ্যে আমরা পাই না। সমালোচক অনিরুদ্ধ আলি আকতার যথার্থই বলেছেন—

> ''এহেন সনকা নাটককার শম্ভু মিত্রের হাতে সৃষ্টি এক আধুনিক নারী; মিথে মধ্যযুগীয় স্বামীপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রী নন। তাছাড়া তাঁর চরিত্রে শ্বাশুড়ি সত্তার আর এক-দিককে সংযোগ করে, তাঁকে নাটককার মিথের সনকা থেকে আর একধাপ সরিয়ে এনেছেন।''[৩৮]

৪. নাটকের চাঁদকে আমরা দেখি শিবভক্ত বণিক সম্প্রদায়। তিনি শুধুমাত্র সামান্য ব্যবসায়ী নন। তার স্বপ্নভরা চোখে ভেসে ওঠে ধনরত্ন পূর্ণ ভবিষ্যতের চম্পকনগরী। মাঝি-মাল্লাদের নিয়ে, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে, নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সে সমুদ্রে পাড়ি দিতে উদ্যত হয়। মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা, লখিন্দরকে নৌ-যাত্রায় পাঠানোর সংকল্প সবই তাঁর নৌ যাত্রাকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। যা মূল কাহিনী থেকে সরে এসে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন ঘটেছে।

৫. নাটকে বেণীনন্দন ও বল্লভাচার্যের মধ্য দিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতার চরিত্র পরিস্ফুট হয়। বিশ শতকে স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতির দোলাচলতা দেখতে পায় এখানে। সৎ, ন্যায় এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেওয়ার মতো উপযুক্ত নেতার অভাব দেশে। করালী ভৈরবরা একসময় দেশের শাসন ক্ষমতায় এলেও তাদের বিলাস-ব্যসন, মানুষের প্রতি অন্যায় ব্যবহার সাধারণ দেশবাসীকে আতঙ্কিত করেছে। মূল কাহিনি থেকে অনেকটা সরে এসেছেন নাট্যকার। এখানে নাটকটি হয়ে উঠেছে তৎকালীন রাজনৈতিক দলিল।

৬. মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনিকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রয়াস দেখা যায় নাটকের শেষে চাঁদ সদাগরের পরিণতি অংশে। মূল কাব্যের মধ্যে দেখা যায় বেহুলা তার ছয় ভাসুর, লখীন্দর এবং চৌদ্দডিঙা মধুকর ধনরত্ন নিয়ে ফিরে আসে স্বর্গ থেকে। চাঁদ বাম হাতে মনসা পূজা দেয় এবং শেষে বেহুলা লখীন্দর (স্বর্গের ঊষা ও অনিরুদ্ধ) স্বর্গে গমন করে। সেই সঙ্গে চাঁদ সদাগর ও অন্যান্য পুত্র-পুত্রবধূরা স্বর্গে গমন করেন। নাটকের মধ্যে শুধুমাত্র স্বামীকে ফিরিয়ে আনে বেহুলা। চাঁদ পুত্র ও পুত্রবধূর জীবনের কথা ভেবে, তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে, বেল পাতা দিয়ে মনসার

পূজা দিয়ে এসে দেখেন বেহুলা-লখীন্দরের পাণ্ডুর মরামুখ। এখানেই ঘটে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, যা নাটকটিকে নতুন মাত্রা দান করে। চাঁদ সর্বহারা মানুষে পরিণত হয়, যা একালের বিধ্বস্ত, পরাজিত মানুষের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

বিশ শতকের মধ্যভাগের দেশজ অন্ধাকারময় আবহকে নাটককার শম্ভু মিত্র মনসামঙ্গলের পুরানো গল্পের ফ্রেমে নতুন মাত্রা সংযোজন করে প্রকাশ করেছেন। চাঁদের জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া, সংসারের বিফল মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন হওয়া, পুত্র-পুত্রবধুর আত্মহনন— সবই চাঁদকে এক নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু শেষে চাঁদের নতুন করে পাড়ি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাই নাটকটিকে জীবনমুখী করে তুলেছে। অন্ধকারের নাটক হয়েও শেষ পর্যন্ত সত্য-শিব-আলোর নাটক হয়ে উঠেছে। আবার মধ্যযুগের মনসাপুরাণ হয়ে উঠেছে চাঁদ বণিকের কাহিনী। এ প্রসঙ্গে সমালোচক চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্তের মন্তব্যটি উল্লেখ করা প্রয়োজন—

> ''বিফল অভিযানে মৃতু-সব সহযাত্রীদের ছায়ামূর্তিরা অলক্ষ্যে স্মৃতি হয়ে ফিরে আসে তাঁর কাছে— অজস্র-অদম্য এক চিরবিদ্রোহীর মতো চাঁদ পাড়ি দেন সেই স্মৃতি নিয়ে নতুন প্রত্যাশার খোঁজে, মহাকালের কালো সমুদ্রের বুকে। ভেঙে যাওয়া সমস্ত স্বপ্নের পুনর্নির্মাণ করার জন্য একাকী অভিযাত্রী চাঁদের চরিত্রের এই ট্রাজিক বিশালতার সন্ধান মিথের কাহিনিতে আমরা পাই না। শম্ভু মিত্র একালের মানুষের মানস বিপ্লবের ব্যঞ্জনায় তাঁকে অনেকটা ব্যাপক অভিব্যক্তিতে অনেকখানি বিস্তীর্ণ মাত্রায় উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন। তাঁর নাটক তাই মনসার 'মঙ্গলগাথা' নয়, 'চাঁদ বণিকের পালা'।''[৩৯]

আর সেই কারণেই 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটক পুরাণের মনসার কাহিনি থেকে সরে এসে বিশ শতকের মধ্য পর্বের ধনতান্ত্রিক চেতনার আগ্রাসী মনোভাব ও ব্যক্তিচেতনার বিপন্নতা নিয়ে লেখা আধুনিক জীবনের নাটক হয়ে উঠে। নাটককার তৎকালীন মানবিক মূল্যবোধ হীনতা তথা মানবিক অবক্ষয়, স্থবির-গলিত সমাজ ব্যবস্থা, এবং তৎকালীন যুব সম্প্রদায়ের ভাবনাহীন, ভবিষ্যৎহীন জীবনযাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন। আসলে তিনি শোষণমুক্ত সমাজ তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন নাটকে। সর্বোপরি মধ্যযুগীয় মনসা-মঙ্গল কাহিনীর মোড়কে নাট্যকার আধুনিক জীবনযন্ত্রণা ও জীবনভাবনা ফুটিয়ে তুলেছেন। আরো বলা যায় অবক্ষয়িত সময়ে দাঁড়িয়ে শম্ভু মিত্র মানুষের জীবনের ভয়াবহ ট্রাজিক অন্ধকারকে যেমন এ নাটকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তেমনি মনসা তথা অন্ধকারই যে মানুষের জীবনের একমাত্র ধ্রুবসত্য নয়— শিব ও আলোই সত্য

একথাও শুনিয়েছেন পাঠক দর্শককে। তাই নাটকের 'পাড়ি দেও— পাড়ি দেও' মন্ত্র হয়ে উঠেছে আধুনিক যুগযন্ত্রণা দগ্ধ মানুষের অন্ধকারময় জীবন থেকে আলোকময় জীবনে উঠে আসার মহামন্ত্র।

'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের ভাষা কোন বিশেষ অঞ্চলের ভাষা নয়। নাটকের বিষয়ের স্বার্থে নাটককার নিজের মতো করে ভাষা গড়েছেন। এর মধ্য দিয়ে যেমন দেশের পুরাকাহিনী জীবন্ত হয়ে উঠেছে তেমনি আধুনিক সমাজের জটিল মানসিকতা বিদ্যুতের ঝলকের মতো ঝলকে উঠেছে এই ভাষায়। সাধারণ মানুষ ও উপরিস্তরের মানুষ উভয়েরই মুখে ভাষা হয়েছে এটি। রাজনৈতিক-কূটনৈতিক চাল, সমাজের লাম্পট্য-নীচতা প্রকাশ পেয়েছে এর মাধ্যমে তেমনি নাটকে মানব-মানবীর চিরন্তন প্রেমের গভীরতাও স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার এই ভাষার মাধ্যমে। তাই ভাষার দিক দিয়েও নব রূপায়ণ ঘটেছে মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের এই নাটকে নাট্যকার শম্ভু মিত্র এই নতুন ভাষা আনয়ণের দিকটিতে সার্থকতা লাভ করেছেন। তাই বলা যায় মনসা-কথাকে কেন্দ্র করে রচনা করলেও নাট্যকার শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি হয়ে উঠেছে আধুনিক জীবনের নাটক।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট অভিনেতা, পরিচালক ও বিদগ্ধ নাট্যব্যক্তিত্ব **শেখর দেবরায়** ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে জুন শিলচর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত হন। 'অন্তিমের সুর' (১৯৮৭) নাটকটি তাঁর প্রথম নাটক হিসাবে আমরা পেয়ে থাকি। ১৯৯২-এ নূতন দিল্লিতে 'সফদর হাশমি মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' আয়োজিত পথ নাটক বিষয়ক কর্মশালায় তিনি প্রশিক্ষিত। আসাম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন শহর, নূতন দিল্লী, লক্ষ্মৌ, এলাহাবাদ, কানপুর, ইম্ফল এবং বাংলাদেশের সিলেট ও মৌলবী বাজার প্রভৃতি শহরে তিনি নাট্যাভিনয় করেছেন। এই সূত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদগ্ধ নাট্যব্যক্তিত্ব-সেলিম আলদীন, রসিদ হারুণ (বাংলাদেশ), বিভাস চক্রবর্তী (কলকাতা), রতন থিয়াম, কাহ্নাইলাল, দোরেন্দ্র সিংহ (মণিপুর), হাবিব তনবীর (দিল্লী) প্রভৃতি ব্যক্তির নাটক, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ও উপস্থাপন কৌশল তাঁকে নাটক রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

বিশ শতকের শেষ পর্ব ও একুশ শতকের সূচনায় বাংলা নাটকের যাত্রা যে কত বিচিত্র পথে এবং বৈচিত্র্যময়ভাবে অগ্রসর হতে পারে, তার একটি বলিষ্ঠ নিদর্শন শেখর দেবরায়ের **'মনসাকথা'** (২০০২) নাটকটি। 'অথ মনসাকথা' নামক লোকপুরাণের কাহিনীকে আশ্রয় করে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন নতুন আঙ্গিকের এই নাটক। পরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'উজান' পত্রিকায় ২০০১

খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ২০০২-এর ডিসেম্বরে শিলচর কালচারেল ইউনিট, শিলচর, কাছাড় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এককভাবে অথবা দলগত ভাবে অভিনয় উপযোগী এই নাটক বাংলা নাট্যমঞ্চ ও অভিনয় জগৎকে এক অভিনব মাত্রায় পৌঁছে দেয়। একুশ শতকের সূচনা পর্বে একদিকে তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রগতি ও ভুবনীকরণের এককেন্দ্রিকতা, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। অন্যদিকে আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজনে চলছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহ্যের বিচার বিশ্লেষণ। এই প্রেক্ষিতেই শেখর দেবরায় রচনা করেন 'মনসাকথা' নাটক। মনসামঙ্গল কাব্য অনুসারী পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠায় রচিত এই নাটকের প্রথমেই দেখতে পাওয়া যায়— গায়েন, বায়েন ও দোহার কর্তৃক দিক বন্দনা ও মনসা বন্দনা। কোটিশ্বরের পুত্র চম্পকনগরের অধিপতি চন্দ্রধরের পরিচয়সূত্রে আমরা শিববন্দনা পেয়ে থাকি। পরিবেশক গায়েন, বায়েন ও দোহারদের সহায়তায় নাট্যকার কাহিনী পরিবেশন করলেও তার কেন্দ্রে রয়েছে চাঁদ, মনসা, সনকা, বেহুলা, লখীন্দর, লেংগা, মাঝিমাল্লা প্রভৃতি চরিত্রগুলি। উক্ত চরিত্রগুলির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাটকটি এগিয়ে যায়। মনসার বন্দনা গান শেষ হলে গায়েন জানিয়ে দেন 'চান্দের' চৌদ্দডিঙা মধুকর যারা বেয়ে যায়, সেই জলে জঙ্গলায় থাকা মাঝিমাল্লারা তাদের বংশের দেবী মনসা তথা নাগমাতা জরৎকারুর পূজা করতে পারে না চাঁদ সদাগরের ভয়ে। যে দেবীকে স্মরণ করলে আপদ নাশ হয়। তাদের মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার সময় সপ্তডিঙার বৈঠা হাতে তুলে মনে মনে তাকে স্মরণ করতে হয়। দেবীকে অমান্য করার যে অপরাধ তা মাঝিমাল্লারা মেনে নিতে নারাজ। তাই সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে সামনের শ্রাবণের পঞ্চমী তিথিতে মাতা মনসার পূজা করবে। মাঝিমাল্লাদের ঐক্যবদ্ধভাবে নাগমাতা মনসার পূজা করার সংকল্প চাঁদের মোটেই মনঃপুত হয় নি। তাই সভার মধ্যে সকলের সামনে বলেন জোরগলায়—

> ''খবর আছে শাওন্যা পঞ্চমীতে নাকি লঘুজাতি কানীর পূজার উজ্জোগ চইলতেছে! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! চেঙ্গমুড়ি কানীর পূজা! নাগ কইন্যারে মাইন্যতা জানাইয়া ফুল-জল তিনি চায়। কিন্তু শুইন্যা রাখ। আমি দেবাদিদেব মহাদেবের ভক্ত চান্দ সদাগর—আমার ক্ষ্যামতার সীমানায় বাবা ভোলানাথ ছাড়া আর কারো পূজা-আচ্চা করা নিষেধ।''[৪০]

এই সময় লেংগার মুখে শুনতে পাওয়া যায়— তাঁর স্ত্রী সনকাই বাড়িতে মনসাপূজার আয়োজন করেছে এবং স্বচক্ষে সনকাকে মানতের 'বারা' নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখলে ক্রুদ্ধ হয়ে মনসাকে ভর্ৎসনা করেন এবং হেমতালের লাঠির আঘাতে মনসার 'বারা' ভেঙে ফেলেন। মাঝিমাল্লারা মনসার এই

অপমানে বেদনাগ্রস্ত হয় এবং সকলে একত্রিত হয়ে চম্পক নগরে সনকার কাছে অভিযোগ জানায়। আজ থেকে চাঁদ সদাগরের মধুকরের কাড়া ধরবে না এবং ডিঙ্গার বৈঠা ধরবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। জল-জঙ্গলায় বসবাসকারী এই দরিদ্র লোকেরা ধীরে ধীরে চম্পকনগরে আগত বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যে মোহগ্রস্ত হয়ে মনের খুশিতে বণিকদের ইচ্ছে মতো প্রাণ তোয়াক্কা করে ডিঙ্গার কাঁড়া ধরেছে। দিন-রাত একাকার করে বণিকের ধনদৌলত পারাপার করেছে, তারপর বোধবুদ্ধি হলে বুঝতে পারে নিজের জীবন কাদের জন্য উৎসর্গ করেছে এই সরল মানুষজনেরা। তাদের শরীরের ঘাম দিয়ে বণিকের দালান গড়ে উঠেছে। হিসেব নিকেশের খাতা খুললে দেখা যায় সদাগররা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়েছে, অন্যদিকে দরিদ্র মাঝিমাল্লা মানুষেরা অমাবস্যার অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। তাই নাটকে ১ম মাঝির সংলাপে শোনা যায়—

> ''মাগো! জোয়ার ভাঁটা জগতের নিয়ম। মোদের জীবনে জোয়ার কই? কেবল দেখি ভাঁটার টান। আগে আইত না, কিন্তু এখন মনে অয়, বণিকের দল বুঝি মোদের ঠকাচ্ছে। মুখে মা মনসার নাম লইয়্যে মোরা বুকে জোর পাই। কেউ যদি মোদের সেই ভাব-ভক্তি নষ্ট করবার চায়— তে অইলে গো মা! তার উপর কি ভরসা রাখন যায়?''[৪১]

মনসাদেবীই তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন, আশার আলোর দিশারী। সেই দেবীর পূজা-অর্চনায় বাধাপ্রাপ্ত হলে তাদের মুখে উঠে আসে বিদ্রোহের ভাষা। সনকার অনুরোধে মাঝিমাল্লারা শান্ত হলেও বিদ্রোহের সুর তাদের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই লখীন্দরের বিয়েতে মনসার পূজা-অর্চনা করা নিষিদ্ধ হলে জালু-মালু এবং অন্যান্য মাঝিরা সাঁতালি পর্বতে মা মনসার কাছে যায় ' চান্দো' সদাগরের অন্যায়ের সুবিচারের জন্য। চাঁদসদাগর হেতালের লাঠি নিয়ে লঘু জাতি চেঙ্গমুড়িকানী বলে অপমানিত করলেও মনসা আপোষেই বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলে। তাঁর মতে উজানের দিকে নৌকা বাইতে গেলে শুধু জোর থাকলে হবে না কৌশলও জানতে হয়। লড়াই-এ কায়দাটাই আসল, গায়ের বলে লোককে বশে আনতে যারা চেষ্টা করে তারা ভুল করে। মাঝিমাল্লারা যে মাথা নুইয়ে আদেশ মানতে নারাজ মনসা সেটা চাঁদকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তার সঙ্গে তাঁরা যাতে মনসাপূজা করতে পারে দেবী স্বয়ং চম্পাই-এর সমাজপতির কাছে আবেদন করেন। অন্যদিকে চম্পক-নগরের সমাজপতি চাঁদ সদাগরকে ন্যায়-অন্যায়ের উপদেশ দেন। দরিদ্র মাঝিদের ধর্মসংস্কারকে মর্যাদা দেওয়ার অত্যন্ত বিনীতভাবে চাঁদকে বলেন। মনে কুটিলভাব রেখে লাভের হিসেবে করলে, অহংকার নিয়ে মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই

হবে না মনসা অত্যন্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে চাঁদ সদাগরকে নৈতিকতার দিকটি দেখানোর চেষ্টা করেন। সময় যে একজায়গায় থেমে থাকে না, তাই চৌদ্দ পুরুষের ভাবনা চিন্তা মনে জমিয়ে না রেখে বর্তমানকে মেনে নেওয়াই ভালো। সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার সময় মাঝিরা মনসার নাম নিয়ে যদি মনে বল পায় তাহলে আপত্তি কিসের? মনসার সন্তানেরা ডিঙ্গা বাইলে দোষ হয় না, কিন্তু ডিঙ্গায় মনসার নাম নিলেই চাঁদের অসুবিধা। এই অনার্য্য আচরণ করতে নিষেধ করেন মনসা। এর প্রত্যুত্তর হিসেবে চাঁদের সংলাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

> ''আরে যা যা। এত নায্যি অনায্যি দেখলি আমার চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর পুন্ন অইবা না। আমার ডিঙ্গার মাঝি যে অইব— তারে আমার মতেই চলতে অইব। আমার রাইজ্যে তোরনামে কোন পূজা পাঠ, গান বাদ্যি করতে দিমু না। এইটাই আমার আদেশ।''[৪২]

মনসাও নায্য পাওনা আদায়ের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই-এ নামতে বাধ্য হন। লড়াই শেষ না হওয়া অব্দি চুপ করে থাকবে না এবং চম্পক নগরের অধিপতি চাঁদ সদাগরের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেন মনসা।

নেতার সঙ্গে যুক্তি করে মনসা চাঁদের ছয়পুত্রকে দংশন করেন। শঙ্ক ওঝাকে বিষ দেয় তবুও চাঁদ চেঙ্গমুড়িকানীর পূজা কাউকে করতে দেয় না। অন্যদিকে সতী লক্ষ্মী মা সনকার অনুরোধে মাঝিমাল্লারা চাঁদের চৌদ্দডিঙ্গা ভাসিয়ে দক্ষিণ পাটনে যায়। মধুকর, শঙ্খচূড়, সিংহমুখী ইত্যাদি সহ চৌদ্দটি ডিঙা বাণিজ্য থেকে ফেরার সময় কালিদহ থেকে হরণ করে পাতালে লুকিয়ে ফেলেন মনসা। চাঁদ সমস্ত কৌশল বুঝতে পেরে কোন দুঃখ না করে কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দরের বিয়ের আয়োজন করেন এবং সেখানে মনসার নামে কোন ফুল-জল দিতে নিষেধ করেন স্ত্রী সনকাকে। মনের দুঃখে মাঝিমাল্লারা মনসাদেবীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানায়। কালকূট দিয়ে সদাগরকে একেবারে শেষ করার কথা বললে মনসা মাঝিদের মনের উচাটন দেখে বলেন, লড়াই করতে গেলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, কৌশল করে চলতে হয়। সমাজপতিকে মেরে ফেললে সবাই এটাই বলবে মনসার পূজা করেনি তাই মারা পড়েছে। নাগগোষ্ঠীর অপমানবোধ ছাড়া সমাজে জিৎ হবে না এতে। যার সঙ্গে লড়াই সেই যদি না থাকে তাহলে পূজা আদায় করবে কার কাছ থেকে। মনসা এখানে কালনাগিনীকে পাঠিয়ে দেন লোহার বাসরে লখীন্দরকে দংশন করার জন্য। লখীন্দরের মৃতদেহ কলার মান্দাসে ভাসিয়ে নিয়ে স্ত্রী বেহুলা নাগলোকে মনসার কাছে উপস্থিত হয়। চম্পকনগরের সমাজপতি 'চান্দো সদাগর' ও সমাজের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বেহুলা মনের জোর ও নিষ্ঠা নিয়ে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে

আনার চেষ্টা করে। নাগবংশের সম্মান আদায় এবং চাঁদের পৌরুষত্বের দম্ভকে বিনাশ করার মনসার যে সংকল্প, তার সঙ্গে যোগ দেয় বেহুলা। বণিকের আর ছয়'টি পুত্রবধূর মতো নিয়তির কাছে হার মেনে বিধবা হয়ে ঘরে বসে থাকেনি বেহুলা। শ্বশুরের বাক্য অমান্য করে নিজের ইচ্ছায় নাগমাতার কাছে আসে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের মন বদলায়, সমাজকেও বদলাতে হয়। তাই বেহুলা নিয়তির নির্মমতাকে অগ্রাহ্য করে নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ধারিত করতে চায়। সদ্য বিবাহিতা নারীর প্রতি যে অন্যায় এবং তার যে দুঃখ, এই প্রতিকার চাইতে এসেছে মনসার কাছে। একটি নারী এসেছে আরেকটি নারীর কাছে দুঃখ-কষ্ট মোচনের আশায়। নাটকে দেখা যায় বেহুলা মনসার দুঃখ-কষ্টেরও ভাগিদারী হতে চায়। কৌশলের সঙ্গে মনসার মনের কথা বলে যে, কায়দা করে চাঁদ সদাগরের কাছ থেকে পূজা আদায় করতে হবে, দাম্ভিক পৌরুষত্বকে নষ্ট করতে হবে। তাকে হত্যা করে নয়। লখীন্দরকে জীবিত করে দিলে স্বামী-স্ত্রী মিলে পূজা প্রচার করবে। এইভাবে মানুষের মন জয় করলে চম্পকনগরে তো বটেই, অন্য সব জায়গাতেও মনসার মাহাত্ম্য প্রচারিত হবে। কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দরের সঙ্গে চাঁদের ছয়পুত্র, চৌদ্দটি ডিঙা, ধন-সম্পত্তি সবই ফিরিয়ে দেন মনসা। যার ফলে বাম হাতে হলেও চাঁদের পূজা আদায় করে মনসা।

মনসা পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও নাটকটি একটি মৌলিক শিল্প কর্মের দাবি রাখে। বাংলার সাধারণ মানুষজন যাদের লৌকিক স্মৃতি থেকে মনসাপুরাণের গভীর ব্যঞ্জনা এখনো মুছে যায়নি। মনসামঙ্গলের নতুন ব্যাখ্যা তাদের আত্মকথাকে ছুয়ে যায়। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্য যে শুধু সর্পদেবীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক কাব্য নয়, নিম্নবর্গের মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াই-এ জয়ী হবার এক ঐতিহাসিক দলিল তা এই নাটকে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। চাঁদ সদাগরের বাম হাতে পূজা দেওয়া আসলে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অন্য এক কায়দা, এই কৌশল বর্তমান যুগেও যে রয়েছে, মধ্যযুগীয় সাহিত্যের পরিমণ্ডলে শেষ হয়ে যায়নি। এর উত্তর খুঁজতে গিয়েই নাট্যকার রচনা করেছেন 'মনসাকথা'। এই প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট নিষ্ঠাবান গবেষক অমলেন্দু ভট্টাচার্য 'মনসাকথা' বইটির মুখবন্ধ অংশে যা বলেছেন এখানে সেটি উল্লেখ করা প্রয়োজন—

> ''এই প্রেক্ষাপটে মনসাকে নাগ জনগোষ্ঠীর দেবী হিসেবে বিচার করাই অধিকতর সঙ্গত। চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্ব স্বীকৃতি আদায়ের লড়াই। শেখর এভাবেই মনসামঙ্গল কাব্যকে দেখেছেন।''[৪৩]

নাটকটির বাইরের মোড়ক প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্য অনুসারী হলেও তৎকালীন সময়ের পটভূমিতে গড়ে তুলেছেন এক নতুন মনসামঙ্গল তথা মনসা-কথা। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের মনসাভীতি

অথবা পৌরাণিক ভক্তিবাদ নয়, নাট্যকার লৌকিক ঐতিহ্যকে সমকালের সমস্যাদীর্ণ মানবচেতনার টানাপোড়েনে যাচাই করে তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যুক্তিবাদ ও মানবতার আদর্শকে।

নাটকটির প্রথমেই দরিদ্র মাঝিমাল্লারা আগে জলে-জঙ্গলে সাধারণভাবে বসবাস করত। সেখানে ধীরে ধীরে বণিক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে। চম্পকনগরে ধীরে ধীরে দালান বাড়ি উঠতে থাকে। এক একটি বণিকের নামে ঘাট নির্মাণ হয়। যে দরিদ্র এই মাঝিমাল্লাদের পরিশ্রমে এতকিছু সম্ভব হয়। অথচ তারাই যেন ধীরে ধীরে দাসে পরিণত হয়, সর্বহারায় পরিণত হয়। একমাত্র সহায় তার বাপ-ঠাকুরদার আমলের দেবী মনসা। এই মনসার পূজাতেই চাঁদ বণিকের আপত্তি। মাঝিমাল্লাদের মাতা হিসেবে নাটকের প্রথম থেকে মনসার সঙ্গে চাঁদের সংঘাত। প্রথম থেকে দেখা যায় ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব, নায্য অনার্য্যের দ্বন্দ্ব যেটি শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে। প্রচলিত মনসাপুরাণের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছে নাটকটি। চাঁদ সদাগরের অটল গাম্ভীর্য, ব্যক্তিত্ব, একক সংগ্রাম, মনসা নামের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই-এর প্রচিলত ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে ফেলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসেন। সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন, স্বার্থবাদী, কোপনস্বভাবা মনসা সম্পর্কিত ধারণাটি এখানে মুছে গিয়ে নতুন পাঠকৃতি উঠে আসে। মনসাকে এখানে সমাজের হিতকারিণী, কল্যাণময়ী, বিপদতারিণী নারী রূপে দেখা দিয়েছেন। মনসামঙ্গলের মনসাকে দেখি যেনতেন প্রকারে পূজা আদায়ের চেষ্টা করেন। নাটকে চাঁদের সাতটি পুত্রের প্রাণনাশ, চৌদ্দটি ডিঙা সমুদ্রে নিমজ্জিত করলেও শেষ পর্যন্ত মনসা আপোষের কথা বলেন। নাট্যকার প্রচলিত পাঠকে বিশ্লেষণ করে মনসা চরিত্রের মধ্যেও এনেছেন নতুন ঐতিহ্য। এই সূত্রে বিশিষ্ট সমালোচক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্যের উক্তিটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

> ''নাগ গোষ্ঠীর দেবী মনসা এখানে কল্যাণময়ী তাঁর উগ্র তেজ বা কপটতা নেই, নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে বদলে যায় নিষ্ঠুরতাও। এইভাবেই প্রচলিত পাঠের বিশ্লেষণের মাধ্যমে একসময় তিনি সহজেই হয়ে ওঠেন মাঝি-মাল্লাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের উৎস।''[৪৪]

দেবী মনসা এখানে মাঝিদের জীবনে আশার আলো। তাদের সুখ, দুঃখ, স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ ঐতিহ্যের দিশারী। এই দেবীর মর্যাদা রক্ষার জন্য চাঁদের বিরুদ্ধাচারণ করতে পিছুপা হয় না। প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্যের যে মনসাভীতি এখানে তা সরে গিয়ে সাধারণ মানুষের রক্ষা ও আশ্রয় দেওয়া তাঁর শ্রেয় হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের পরিত্রাতা হিসাবে দেবী মনসার আবির্ভাবের ঘটনাটি নাট্যকারের অভিনব সংযোজন। বেহুলা কর্তৃক চাঁদের মনসা পূজা করানোর প্রতিজ্ঞা মনসার কৌশল বলে চাঁদ

মনসাপূজা দিলেও বাম হাতে দেয়। বাম হাতের পূজা যে অমান্যের পূজা তবুও মনসা এই পূজা অস্বীকার করেননি। কারণ তিনি আশা রাখেন বাম হাতে হলেও চাঁদ পূজা দিয়েছে। এমন একদিন আসবে মনসা তথা নাগেদের মাহাত্ম্য মানুষের মুখে মুখে গান হয়ে ফিরবে। বাম হাতের যে পূজা আরম্ভ হয়েছে সেটি চলতে থাকবে। মনসার মতে লড়াই আরম্ভ করে একজন শেষ করে অনেকজন। শোষক শ্রেণীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তা চলতে থাকবে। এখানে মনসাকে সাধারণ মানুষের আন্দোলনের নেত্রী রূপে দেখা যায়। তার উপদেশে মাঝিরা শরীরে বল পায়। নাটকের শেষে মাঝিদের উক্তিটি গায়েনের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে—

> ''মা গো! আরম্ভ করেছ তুমি, কিন্তু শেষ করব আমরা। যতদিন বাম হাতের মাইন্যতা ডাইন হাতে আনতে না পারছি ততদিন আমরাও ক্ষান্তি দিমু না! কোনদিন না! জয় মা বিষহরি! জয় মা অমৃতনয়নী! জয় মা মনসা! জয় মনসার জয়!''[৪৫]

মনসাদেবী নিজেকে শিবকন্যা বলে জানেন, সেখানে পূজা পাওয়ার চেষ্টাকে কোন অন্যায় মনে করেন নি। নিজের অধিকার আদায়ের লড়াই, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই দেখা যায়। 'মনসা কথা' নাটকটিতে মনসা কাহিনীর অনেকগুলি ব্যাখ্যা উঠে এসেছে। একটি হল নারীবাদী ব্যাখ্যা। চাঁদ বণিক স্পষ্ট জানিয়ে দেয় দেবাদিদেব মহাদেবের পূজক হয়ে নারী দেবতা চেঙ্গমুড়ি কানীর পূজা কিছুতেই করবে না। এখানে নারী হিসাবে মনসার লড়াই-এ সঙ্গী হয় চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ বেহুলা। লখীন্দরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে বেহুলা মৃতদেহ নিয়ে বিষবদ্দি নাগেদের দেশে যেতে চাইলে নারীজাতির তেজ দেখে যেতে দিতে নারাজ চাঁদ সদাগর। নারীজাতির এভাবে গৃহের বাইরে যাওয়া নিষেধ, বংশের ইজ্জত বলে কথা। কিন্তু চাঁদ যত বাঁধা দেয় বেহুলা ততই জেদ ধরে। সমাজ বিধানের নামে ভাসুরের বিধবা বউদের মতো ঘরে থাকতে নারাজ। সে কিছুতেই তা মানবে না। নেতা ধোপানীর সাহায্যে মনসার কাছে উপস্থিত হয়। পুরুষ চম্পক অধিপতি মনসা নারী বলে তাকে অমান্য করে, এই অন্যায়ের বিরোধিতা বেহুলাও নিঃসঙ্কোচে করে। মনসার কাছে তাই সে অনায়াসেই বলে—

> ''চান্দ বণিক্য আমার শ্বশুর বটে, কিন্তু আমি তো শ্বশুরের বাক্যি মান্যি করি নাই। আমি এয়েছি নিজের ইশ্চায়। আমার অদ্দিষ্ঠ নিজেই ঠিক করমু। আমি উজানী নগরের কইন্যা চম্পকের সমাজপতির পুতের বউ এয়েছি নাগমাতার কাছে। এক নারীর কাছে আরেক নারী এয়েছে

তার দুক্ষের পিতিকার চাইতে!”[৪৬]

চম্পক নগরের ঘাটে চাঁদের ছয়পুত্র, লখীন্দর, চৌদ্দটি ডিঙা, ধন-সম্পত্তি ফিরে পেলে, সব কিছুর মূলে যে বেহুলা সেটি বুঝতে পারেন। শেষে চাঁদ কিছুটা কৌশল অবলম্বন করলেও বেহুলার অনুরোধে পূজা দিতে বাধ্য হয়। বেহুলা চরিত্রকে এখানে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক।

মনসামঙ্গল কাব্যে আমরা দেখি দেবতা ও মানুষের সংগ্রামে মনসার জয়লাভ হলেও চাঁদসদাগরের পরাজয় হলেও যে মানুষের জয় লাভ হয়েছে— শেখর দেবরায় এই সত্যটি পরিবর্তিত করে চাঁদের যে পৌরুষত্ব, আদর্শ এবং একক সংগ্রামের ঐতিহ্যগুলি এখানে মুছে ফেলেন। চাঁদ সদাগরকে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিভূ রূপে দাঁড় করান। তাঁর বাম হাতের পূজা দেওয়া সামন্ততান্ত্রিক কৌশল রূপে তুলে ধরেন নাট্যকার। অন্যদিকে মনসার পূজা তথা সেবক সাধারণ মানুষের সংগ্রাম এই নাটকে গৌরবান্বিত হয়েছে। নিম্নবর্গের মানুষের অধিকার আদায় ও সংগ্রামে জয়ী হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় প্রতিষ্ঠা করে এখানে তিনি প্রচলিত পাঠকেই সরিয়ে দেন। এ এক নতুন মঙ্গলকাব্য হয়ে ওঠে। আসলে নাটকটিতে দুই যুগের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে— মনসামঙ্গল কাব্য লিখিত হওয়ার সময়কাল এবং বর্তমান সময়ের মধ্যে। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ তৎকালীন সমাজকালের প্রেক্ষাপটে কাব্য রচনা করেছিলেন। অন্যদিকে শেখর দেবরায় বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে, বর্তমান মানসিকতায় নাটক লিখেছেন। স্বাভাবিকভাবেই নাটকটি প্রচলিত পাঠ থেকে সরে এসে এক নতুন পাঠ হিসেবে বিরাজমান হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে নাট্যপ্রেমী এবং নাট্যকারের বন্ধুবর অমিতাভ দেবচৌধুরীর ‘মনসা কথা : প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা’ অংশের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা প্রয়োজন—

> ‘‘সবচেয়ে ভালো লাগে যখন নাট্যকার তাঁর স্বঘোষিত কথকের অবস্থান থেকে, মধ্যযুগীয় সময়-বলয় থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক যুগের দর্শকদের সম্বোধন করে আধুনিক যুগের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের যুগের দ্বন্দ্ব ও মিলনকে চোখের ওপর আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দেন।”[৪৭]

তিনি আরো বলেন যে, মনসাকে নাট্যকার বর্ণনা করেন মাঝিমাল্লাদের, অত্যাচারিত মানুষের মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে তাদের মনসাকন্যা রূপে। তাদের শোষিত, বঞ্চিত, জর্জরিত জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা, দৈনন্দিন মালিন্যের উর্দ্ধে একমাত্র প্রেরণা রূপে। আসলে দেবতা মানুষেরই রূপক। মানুষ যা হয়ে উঠতে পারত, যা হয়ে উঠতে চাইত কিন্তু পারেনি। তাকেই সে দেবতা রূপে কল্পনা করেছে।

নাট্যকার পরিবেশক গায়েনের সংলাপের মধ্যে যে যুক্তি-বুদ্ধি, তর্ক, দ্বন্দ্ব নিয়ে এসেছেন সেটিও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রাখে। আঙ্গিকের দিক দিয়েও এটি নতুনতর হয়ে উঠেছে। চাঁদ

মনসা পূজায় বাধা দিলেও সাধারণ মাঝিমাল্লারা যেখানে চাঁদের ডিঙা বেয়ে রোজগার করে, জীবনধারণ করে সেখানে তাঁর আদেশ অমান্য করা উচিত নয়। আবার চাঁদ সদাগরের উচিত মাঝিমাল্লাদের নিজের মতো করে বাঁচতে দেওয়া। কারণ নিজের সমাজ, আচার, আচরণ, ধর্ম, সংস্কারকে বাদ দিয়ে কোন মানুষই সুস্থভাবে বাঁচতে পারে না। ভব নদীতে ডিঙ্গা বাইতে বাইতে মন যখন অশান্ত হয়ে আসে, ঝিমুনি আসে তখন সমাজ ধর্মের বিশাল বৃক্ষ মানুষের মনে শান্তির জল ছড়ায়। জন্মের পর থেকে যে বৃক্ষের সঙ্গে আমাদের চেনাজানা, কেউ যদি শেকড় উপড়ে ফেলতে চায় তা হলে তা মেনে নেওয়া যায় না। মেনে নেওয়া উচিত নয়। একজনের ধর্ম অন্যের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার যে মৌলবাদ, তা নাটকে ফুটে উঠেছে। তার সঙ্গে জীবন সম্পর্কিত নৈতিক প্রশ্নগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। যা মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যে আমরা দেখতে পাই না।

মনসামঙ্গল কাব্য বাংলার সব অঞ্চলেই প্রচলিত। মূলত নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যেই কাব্যটির জনপ্রিয়তা ব্যাপক। সাধারণ মানুষদের কাছে উপস্থাপনের লক্ষ্যেই এক ঔপভাষিক রীতি ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। তিনি বরাক উপত্যকার বহমান এক লোকভাষাকে, পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে, অন্য এক ভাষারূপ দিয়েছেন। বিশেষ কোন একটি ঔপভাষিক রীতি অবলম্বন করলে, অন্য ঔপভাষিক অঞ্চলে সেটি আয়ত্ত করতে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই নাট্যকার নিজস্ব একটি সংলাপভঙ্গি ব্যবহার করেছেন, যা উপভাষাকে ইঙ্গিত করলেও আঞ্চলিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এইভাবে সংলাপের মধ্যেও অভিনব মনস্কের পরিচয় পাওয়া যায়।

নাটকের বক্তব্যের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষার জন্য দু-একটি কাব্যাংশ নাট্যকার কর্তৃক রচিত হলেও বাকি যে পয়ার ত্রিপদীগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা মনসামঙ্গল কাব্যের স্মরণীয় কবি-ব্যক্তিত্ব বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, নারায়ণ দেবের কাব্য থেকে গৃহীত হয়েছে।

নিম্নবর্গের মানুষের সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং ধর্মচেতনার প্রেক্ষিতটি নতুনভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নাট্যকার মূল পাঠকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছেন। বরাক উপত্যকার লোকজীবনকে পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে, লোকনাট্যের আদলে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নাটক রচনা করেন। মনসামঙ্গলের কাহিনীকে নিয়ে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে তৈরি করেছেন এক নতুন নাট্যরূপ। পরিবেশন রীতির বৈচিত্র্যে, মঞ্চসজ্জা, অভিনয়, গীতাবদ্যের ব্যবহার পটভূমি সৃষ্টির অভিনবত্বে তৈরি শেখর দেবরায়ের এই 'মনসা কথা' তাই আক্ষরিক অর্থেই হয়ে ওঠে বাংলা নাট্যশিল্পের আধুনিক পুনর্নির্মাণ।

দীর্ঘপথ পরিক্রমায় ফলস্বরূপ বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিচিত্র ভাবনা ও প্রকরণে নানা পরিবর্তন। ব্যক্তি যেমন নিজের ভাবনা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ ঘটান রচনার মধ্যে, তার সঙ্গে স্থান ও কালভেদেও ভিন্নতা আসে আধুনিক বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও দেখি মনসা কথাকে নিয়ে নাট্যকারগণ রচনা করেছেন নাটক। তবে প্রত্যেকটি নাটকেই নাট্যকারের নিজ নিজ নৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। নাট্যকার মন্মথ রায় তাঁর 'চাঁদ সদাগর' নাটকের চাঁদ মনসামঙ্গলের অনুরূপ দেবীর পূজা দিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর কাছে শিব ও মনসা একাকার হয়ে উঠেছে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্ভু মিত্রের 'সওদাগরের নৌকা' ও 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে তৎকালীন যুগযন্ত্রণাময় পরিস্থিতির আত্মসংকটকে তুলে ধরেছেন এবং ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে চলার কথা বলতে গিয়ে হাত বাড়িয়েছেন অতীতের ঐতিহ্যের দিকে। মনসামঙ্গলের চাঁদ চরিত্রকে দাঁড় করিয়েছে সত্যের পথের কাণ্ডারী রূপে। তবে শেখর দেবরায়ের মধ্যযুগের চাঁদ চরিত্রের আমূল পরিবর্তন আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এখানে সাধারণ দরিদ্র মানুষের পরিত্রাতা হিসাবে মনসাদেবীকে দেখিয়েছেন নাট্যকার এবং তার প্রতিপক্ষ হলেন চাঁদ সদাগর। পরিশেষে বলা যায়, মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের মিথকে নিয়ে নাটকগুলি রচনা হয়েছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে সেগুলি হয়ে উঠেছে মনসা-কথার নবরূপায়ণ।

তথ্যসূত্র:

১. মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬ বিপিন বিহারী স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৩১১, পৃ. ৭৪।

২. তদেব, পৃ. ৮১

৩. তদেব, পৃ. ৮২

৪. তদেব, পৃ. ১০১

৫. তদেব, পৃ. ১০৭-১০৮

৬. তদেব, পৃ. ১১০

৭.তদেব, পৃ. ১১১

৮. তদেব, পৃ. ভূমিকা, vii.

৯. ড. জয়তী ঘোষ, মন্মথ রায় : জীবন ও সৃজন, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০০০, পৃ. ৪২

১০. মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬ বিপিন বিহারী স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৩১১, পৃ. ৭২

১১. তদেব, পৃ. ১০২

১২. সনৎ নস্কর, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ২০১২, পৃ. ২০৪ দ্র. 'অনুসৃজনে মনসাপুরাণ'।

১৩. অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড) সম্পাদনা ড. সন্ধ্যা দে, ভূমিকা অশোক মুখোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-০২, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি-২০১১, পৃ. ২৯৩

১৪. তদেব, পৃ. ২৯৭

১৫. তদেব, পৃ. ৩০৬

১৬. তদেব, পৃ. ৩১৬

১৭. তদেব, পৃ. ৩১৭

১৮. তদেব, পৃ. ৩৪৬

১৯. তদেব, পৃ. ৩৩২

২০. তদেব, পৃ. ৩৪৭

২১. তদেব, পৃ. ৩৪৭

২২. শম্ভু মিত্র : 'চাঁদ বণিকের পালা', এম.সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুর্য্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৩৮৪, পৃ. ১৪

২৩. তদেব, পৃ. ২৬

২৪. তদেব, পৃ. ৩৩

২৫. তদেব, পৃ. ৪৪

২৬. তদেব, পৃ. ৪৫

২৭. তদেব, পৃ. ৪৮

২৮. তদেব, পৃ. ৫৮

২৯. তদেব, পৃ. ৭০-৭১

৩০. তদেব, পৃ. ৭৭

৩১. তদেব, পৃ. ৮২

৩২. তদেব, পৃ. ১১২

৩৩. তদেব, পৃ. ১৩১

৩৪. তদেব, পৃ. ১২৬

৩৫. তদেব, পৃ. ১৩১

৩৬. তদেব, পৃ. ২৭

৩৭. সনৎ নস্কর, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ২০১২, পৃ. ২০৮-২০৯

৩৮. অনিরুদ্ধ আলি আকতার : চাঁদ বণিকের পালা-প্রাসঙ্গিক কিছু ভাবনা, গ্রন্থ বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ২৬ শে জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ৬১

৩৯. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত : 'মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ২০০১, পৃ. ২২০-২২১

৪০. শেখর দেবরায় : মনসাকথা, শিলচর কালচারাল ইউনিট, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, শিলচর-৭৮৮০০৭, কাছাড়, ২০০২, পৃ. ৪

৪১. তদেব, পৃ. ১২

৪২. তদেব, পৃ. ২২-২৩

৪৩. তদেব, পৃ. মুখবন্ধ অংশ

৪৪. প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য : 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর', বাক্‌প্রতিমা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯, জুলাই, ২০১২, পৃ. ২২২

৪৫. শেখর দেবরায় : মনসাকথা, শিলচর কালচারাল ইউনিট, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, শিলচর-৭৮৮০০৭, কাছাড়, ২০০২, পৃ. ৪৬

৪৬. তদেব, পৃ. ৩৫

৪৭. তদেব, পৃ. (মনসাকথা : প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা)

*****